নট ফর সেল

sean
PUBLICATION

রেহনুমা বিনত আনিস

আমরা বই পড়ি কেন? জানার জন্য। নিজেদের জানা, এ পৃথিবীকে জানা, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। এই জ্ঞানই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

জ্ঞানের আধার বই। জ্ঞানচর্চা আমাদের ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। তথ্য বিস্ফোরণে জ্ঞান আজ কোণঠাসা। শিক্ষার দৈন্যতায় অজ্ঞতার মহামারী। জ্ঞানার্জনে অনাগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের দুর্বোধ্য ভাষা, মলিন প্রচ্ছদ আর জীর্ণ পৃষ্ঠা পাঠ অনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। গ্রন্থকারাগারে বন্দি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের নয়, চারদিকে আজ লঘু বিনোদনের জয়জয়কার।

সিয়ান পাবলিকেশনের স্বপ্ন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপস্থাপন। ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর জ্ঞান।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ এবং তথ্যসূত্রে প্রামাণ্য; আমাদের লক্ষ্য সাবলীল ভাষা এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। সময়, শ্রম ও সম্পদ সাশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নিমিত্তে আমাদের রয়েছে ই-কমার্স সংযুক্তি www.-seanpublication.com ক্লিকেই বই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের এ প্রসার আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশা আল্লাহ।

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

নট ফর সেল

নট ফর সেল

রেহ্নুমা বিন্ত আনিস

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

নট ফর সেল
রেহ্‌নুমা বিন্‌ত আনিস

প্রথম প্রকাশ

রবিউস সানি ১৪৩৬ হিজরি৷ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ

মুহাররম ১৪৩৭ হিজরি৷ নভেম্বর ২০১৫

তৃতীয় মুদ্রণ

রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি৷ ডিসেম্বর ২০১৭

চতুর্থ মুদ্রণ

জমাদিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি৷ মার্চ ২০১৮

পঞ্চম মুদ্রণ

জামাদি'উস-সানী ১৪৪১ হিজরি। ফেব্রুয়ারি ২০২০

ISBN: 978-984-33-8900-8

পৃষ্ঠা সজ্জা: মাস'উদ শারীফ

প্রচ্ছদ: শরীফুল আলম

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

দোকান নং ৩, দ্বিতীয় তলা
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫৩ ৩৪৪ ৮১১

সূচি

প্রকাশকের কথা

অধুনা নাগরিক সভ্যতায় বিনোদন মাত্রই দূষণ। বোকাবাক্সকে হারাবার জো নেই। বাইরে বেরুনোও হয় না। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ কাজ থেকে বিরতি নিতে ছুটে যেত প্রকৃতির কাছে। আজকাল যখন কাজ আর পড়াশোনাতে পরিশ্রান্ত মানুষ জিজ্ঞেস করে, "কী করব?" তখন বলার মতো খুব বেশি উত্তর থাকে না। প্লেজার রিডিং বা আনন্দের জন্য পড়া সেইসব দামি কাজগুলোর মধ্যে একটি যা মানুষকে গতানুগতিকতা থেকে ছুটি দেয় আবার চিন্তাশীলতারও উন্মেষ ঘটায়।

পেয়ালার কোন অংশটা বেশি দামি? দেয়াল না ভেতরের ফাঁকা জায়গাটা? পেয়ালার দেয়াল খাওয়া যায় না, তবে ভেতরের তরলটুকু খাওয়া যাবে না যদি দেয়ালটা না থাকে। আমাদের ভাবনাগুলো এই খালি জায়গাটার মতো। কিছু ভাবনা প্রদত্ত উপমাটির সমার্থক—অন্তঃসারশূন্য। কিছু ভাবনা মানুষকে আলোর দিকে নেয়, কিছু ভাবনা অন্ধকারে। সবকিছু ঐ শব্দের দেয়ালেই ঘেরা।

শব্দের ক্ষমতা কত তা বোঝার জন্য আমরা আল-কুর'আনের দিকে তাকাতে পারি। আল্লাহর বেছে নেওয়া কিছু শব্দ মানুষকে যুগ যুগ ধরে পথ দেখাচ্ছে। এই শব্দমালার অলৌকিকতা মৃত মানুষ জীবিত করার চেয়েও শক্তিশালী, জলরাশিকে বিচ্ছিন্ন করার চেয়েও ক্ষমতাবান।

ধর্ম ছেড়ে যদি সেক্যুলার জগতেও আসি, হাল জমানায় 'হিমু' চরিত্রটি দিয়ে লেখক কত তরুণকে যে মোহগ্রস্ত করলেন তার লেখাজোকা নেই। পাবনা পাগলাগারদে 'হিমু' ওয়ার্ড আছে বলে শুনেছি। হিমু'র লেখকের শব্দের জালে জড়িয়ে বিকারগ্রস্ত মানুষদের ঠিকানা নাকি এই ওয়ার্ডটি।

আমরা কামনা করি জাতীয় মানসিক সুস্থতা। চিন্তাশীলতা। সৃষ্টিশীলতা। এসব সেক্যুলার লেখক বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে পৃথিবীকে দেখেন, তাদের বিশ্বাস-চেতনা কী—তা বর্তমান প্রজন্মের প্রায় সকলেরই জানা। তবে একজন বিশ্বাসী কীভাবে পৃথিবীকে দেখেন তা সেক্যুলার মধ্যবিত্তরা জানে না। বিশ্বাসী মানুষদেরও যে একটা আদর্শ ও নৈতিকতার শক্ত ধারা আছে তা সমাজের বহুলাংশের কাছে অজানা।

নট ফর সেল—কোনো প্রচলিত ধারার ইসলামি বই নয়। মূলত এটি কোনো ইসলামি বই-ই নয়। এটি একজন বিশ্বাসী মানবীর লেখা একগুচ্ছ ভাবনা। নিজেকে দেখা, সমাজকে দেখা, পৃথিবীকে দেখা। নিছক আনন্দ পাবার জন্য পড়া হলেও পড়া শেষে রয়ে যাবে কিছু ভাবনার খোরাক। কিছু আত্মজিজ্ঞাসা।

সিয়ান পরিবারের পক্ষে

শরীফ আবু হায়াত

আমার মাকে কেন বিশ্বসুন্দরী করা হয় না?

আমার বয়স তখন দশ বা এগারো। আবুধাবীতে হুলুস্থূল শোরগোল পড়ে গেল। প্রথমবারের মতো টেলিভিশনে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা সম্প্রচারিত হবে। আমি বুঝি না কিছুই। কিন্তু সবাই লাফায় তাই আমিও লাফাতে লাগলাম। বাসায় গিয়ে বাবাকে বললাম, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা দেখব। টিভির অনেক অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারেই আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিছু অনুষ্ঠান বাবা রেকর্ড করে সেন্সর করে দেখতে দিতেন। কিন্তু এটা বন্ধুবান্ধবের কাছে মানসম্মানের প্রশ্ন। জেদ ধরলাম দেখতে দিতেই হবে।

জেদ ধরলাম বটে, কিন্তু এটা যে আসলে কীসের প্রতিযোগিতা সে ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে বাবাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আসলে কীসের প্রতিযোগিতা?'

বাবা বললেন, 'এই প্রতিযোগিতা হলো সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাদের নির্বাচন করে এখানে নিয়ে আসা হয়, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর তা নির্ধারণ করার জন্য।'

আমি বসে রইলাম দেখার জন্য। না জানি এবার স্বর্গের অপ্সরীদের মর্ত্যেই দেখতে পাব!

কড়া মিউজিক আর বর্ণাঢ্য আলোকমালার ঝলকানির মধ্য দিয়ে শুরু হলো সুন্দরী প্রতিযোগিতা। প্রথমেই সব সুন্দরীদের জড়ো করা হলো স্টেজে। তাদের দেখে আমি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। বাংলাদেশের গলি

ঘুপচিতেও এদের চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। আমার মাকে দেখেই তো দেশ-বিদেশের সবাই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করত, জিজ্ঞেস করত মা'র বিবাহযোগ্যা বোন আছে কি না। বাবাকে বললাম, 'এদের চাইতে মা'কে বিশ্বসুন্দরী করা হলেই তো ভালো হতো!'

বাবা হো হো করে হাসতে লাগলেন, 'তুমি কি চাও তোমার আম্মু এভাবে সবার সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করুক, আর কিছু অপরিচিত লোক তার সৌন্দর্য নাম্বার দিয়ে বিচার করুক?'

তাই তো! ব্যাপারটা তো এভাবে ভাবা হয়নি কখনো! পরে বুঝেছি এই বিশ্বসুন্দরী নির্বাচন কত বড় প্রতারণা। প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার মা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এবং তার বাবা সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ; তা তারা দেখতে যেমনই হোন না কেন। কোনো শিশুকে কি বলতে শুনেছেন, 'আমার বাবা সুন্দর না, আমি এখন থেকে টম ক্রুজকে বাবা ডাকব' বা 'আমার মা সুন্দরী নন, আমি এখন থেকে ঐশ্বর্য রাইকে মা ডাকব?' তাহলে কীসের ভিত্তিতে একজন মানুষকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হিসেবে নির্বাচন করা সম্ভব; যেখানে পৃথিবীর সব মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুভূতিগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি? বিবেচনায় আনা হয়নি তাদের গুণাবলিও। তাহলে এমন একটি অসার প্রতিযোগিতার আয়োজন করার অর্থ কী?

একসময় বুঝতে পারলাম, এটি মূলত নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে নারীকে ব্যবসার উপকরণে রূপান্তরিত করার একটি আধুনিক ও মোক্ষম উপায়। আদিকালে লোকালয় থেকে মেয়েদের অপহরণ করে পুরুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য নানান দেহজ পেশায় বাধ্য করা হতো; কখনো কখনো অভাব বা অসহায়ত্ব তাদের এসব পেশায় ঠেলে দিত। কিন্তু এখন আমরা জাঁকজমক করে সর্বস্তরের মেয়েদের স্বেচ্ছায়, সর্বসমক্ষে এবং বাবা-মা'র আশীর্বাদসহকারে এই জাতীয় নোংরা পেশায় যোগ দেওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করি। তারা 'ব্যবসায়' নামার আগেই নিজেদের অ্যাডভার্টাইজ করার মতো একটি প্ল্যাটফর্ম পায়, বিখ্যাত হবার সুযোগ পায়। আর লোকজনও তাদের ছি ছি করে না, বরং বাহবা দেয়।

একদল চতুর লোকেরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হলো এমন একদল মেয়েকে খুঁজে বের করা, যারা নিজেকে পণ্য হিসেবে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, খ্যাতির জন্য তারা তাদের মান-সম্মান সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, যাদের পরিবার যথেষ্ট লোভী অথবা বোকা। অতঃপর তারা এদের একজনকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন করে তাকে দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কিছু ভালো কাজ করিয়ে তা ফলাও করে প্রচার করে। এটি একপ্রকার মুলা ঝুলানো। কেননা তখন বাকি সুন্দরীরা কে কোথায় গেল, বা কী করল তা নিয়ে মানুষ আর মাথা ঘামায় না।

ধন্য মিডিয়া। এ যেন শাঁখের করাত। সে নিজেই এই মেয়েগুলোর পতন ঘটায়, আবার এই পতনের কাহিনী নাটক সিনেমা নিউজ আকারে তুলে ধরে। 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও'—ফিলসফির যেন এক বাস্তব প্রয়োগ। তবে এই মিডিয়ার ফাঁকফোকর গলিয়েই আমরা আবার জেনে যাই, বাকি মেয়েগুলোর কী হয়। সৌন্দর্যের খেতাবপ্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর মেয়েগুলো বাস্তবের জন্য প্রস্তুত থাকে না মোটেই। ফলে যারা 'রিজেক্টেড' হয় তাদের অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। উপরন্তু নিজের সৌন্দর্যকে বর্ধিত করা ব্যতীত তেমন আর কোনো যোগ্যতা অর্জনের আগ্রহ বা সময় তাদের হয় না। তাই রূপ-সৌন্দর্যটাই তাদের একমাত্র পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়।

যারা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হয় তাদের প্রথম টার্গেট হয় মডেল বা অভিনেত্রী হওয়া। হায় রে! মডেল মানে তো কাপড়ের হ্যাঙ্গার বা পণ্য বিকানোর জন্য মানুষের ব্যবহার! বান্ধবী শিমু বলত, 'সিনেমার নামে কী সুকৌশলে আমাদের পর্ণোগ্রাফির টুকরো টুকরো ডোজ গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা নিজেরাও টের পাচ্ছিনা!' একটু ভেবে দেখুন, যে মেয়েটি এবং যে ছেলেটি অভিনয় করছে তারা আদতেই কেউ কারও কিছু নয়। অথচ একে অপরকে স্পর্শ করা থেকে অবলীলায় পরস্পরের সাথে শুয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবই তারা নির্দ্বিধায় করছে, নিছক ক'টা পয়সার জন্য। আর আমরা সব জেনেও না জানার ভান করে, সপরিবারে সাড়ম্বরে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বিশালাকার টিভি, ডিভিডি ইত্যাদি কিনে তাদের কীর্তিকলাপ দেখছি! এসব অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমরা আত্মীয়-স্বজন আসলে বা ফোন করলে বিরক্ত হই, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবের জন্য আমাদের হাতে কোনো সময় নেই।

আমাদের সন্তানদের কাছে এখন নাটক-সিনেমার নায়িকা আর মডেলরাই আদর্শ। তাহলে আমাদের সন্তানেরা মডেল হওয়া বা অভিনেত্রী হওয়াকে উত্তম পেশা মনে করবে না কেন? ফলে আমাদের সন্তানদের স্বপ্ন এখন ডাক্তারি, শিক্ষকতা বা জনসেবামূলক কোনো পেশা গ্রহণের পরিবর্তে মডেল বা নায়িকা হওয়াতে গিয়ে ঠেকেছে। খুবই আশ্চর্য লাগে যখন শোনা যায়, অমুক নায়িকা খুব ভালো, সে অভিনয় করার সময় তার মা সাথে থাকে। আহারে, কী পবিত্র কাজে মা তার মেয়েকে সাহচর্য দেন! আরেকবার শুনলাম অমুক নায়িকা খুব ভালো, সে শুধু তার স্বামীর সাথেই অভিনয় করে। কি মজা! স্বামী-স্ত্রীর প্রেম কি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনী দেওয়ার মতো ব্যাপার, নাকি পয়সা উপার্জনের জন্য পুঁজি করার মতো পণ্য?

হলিউডের বিখ্যাত ফন্ডা পরিবারের খ্যাতনামা অভিনেত্রী জেন ফন্ডা থেকে শুরু করে ষাটের দশকের সকল আমেরিকান অভিনেত্রী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যেকোনো প্রকার রোল পাবার জন্য তাদের আগে ডাইরেক্টরদের 'সন্তুষ্ট' করতে হতো। আর আজকাল তো ঘরের কাছেই বলিউডে নায়িকারা কীভাবে সিনেমায় সুযোগ পান তা নিজেরাই প্রচার করেন। যারা মডেলিং করেন তাদের অবস্থাও তথৈবচ। ব্যতিক্রম আছে, তবে তাকে তো আর নিয়মের মধ্যে ধরা যায় না! একটু ভেবে দেখুন, যদি একজন অভিনেত্রী, মডেল, গায়িকা বা নর্তকীর গুণই তার আসল পরিচয় হয় তবে তাকে পুতুলের মতো সাজিয়ে, ক্যামেরার নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করে তার দৈহিক শৈলীকেই কেন মূল উপজীব্য করে তুলে ধরা হয়? কেন নানা ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ করে তাদের নিয়তই কনভিন্স করার চেষ্টা করা হয় যে, তারা ভারী সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি; যেখানে তারা নিজেরাও জানে কোনো মানুষই সবদিক মিলিয়ে সবচেয়ে সুন্দর হতে পারে না?

এ তো গেল যাদের কোনো উপায়ে এইসব ইন্ডাস্ট্রিতে ঠাঁই হয় তাদের কথা। যাদের হয় না, তাদের অবস্থা আরও করুণ। সৌন্দর্যের গৌরবে এবং তা ধরে রাখার খরচ জোগাতে গিয়ে তাদের পক্ষে সাধারণ মেয়েদের মতো যেনতেন কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হয় না সাধারণ কোনো পুরুষের ঘরনি হওয়া। ফলে এদের একটা উপায় হয় কোনো রূপের পূজারী বড়লোক পুরুষকে বিয়ে করা। যাদের ভাগ্য ততটা ভালো হয়

না তারা কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ নিরুপায় হয়ে কখনো অন্য মহিলার পয়সাওয়ালা স্বামীর ঘাড়ে ঝুলে পড়ার কায়দা করে, কেউ ব্যর্থ হয়ে 'নিজেকে বিসর্জন' দিয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে।

এই কি জীবনের সার্থকতা?! এই কি রূপের সার্থক ব্যবহার?!

একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। একবার এক বিশাল ধনী আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছি। খানিক পর ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন। শার্টপ্যান্ট পরা। তবে সত্যিই তিনি অসাধারণ সুন্দরী মহিলা। নখের আগা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সৌন্দর্য চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে যেন। কিন্তু তার সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে মুক্তোর মতো কিছু অশ্রুবিন্দু তার মসৃণ গাল বেয়ে নেমে এল। বিয়ের ছ'মাসের মাথায় তার প্রতি স্বামীর সকল আকর্ষণ শেষ। তিনি রান্না পারেন না, সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি তার আকর্ষণ নেই—নানান অভিযোগ। ওদিকে স্বামীর পার্টি লাইফের নেশা কেটে গেছে। অর্থ-বিত্তে কিছুটা ভাটা পড়ায় রূপচর্চার বিশাল খরচ জোগানোও এখন আর তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না; সংসার ভাঙে ভাঙে অবস্থা। সেই অসম্ভব সুন্দর মুখে মুক্তোর মতো জ্বলজ্বলে অশ্রুবিন্দু সেকথাই জানান দিল যে, রূপে নয়; গুণেই পরিচয়।

সুতরাং চলুন, আমরা রূপের নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুণের চর্চা করি। আর রূপ? একটি জীবন পার করার জন্য পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট!

আমি 'লেডি' নই

টাইটানিক মুভিটা আমার ভাইরা আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে দেখিয়েছিল, অনেক ভাগে বিভক্ত করে। একবার প্রথম ভাগ, একবার শেষভাগ, আরেকবার মধ্যভাগ। আমার রুচিতেই মনে হয় কিছু একটা সমস্যা আছে। আমার কোনো ভাগই ভালো লাগলো না! আমি মনে হয় আসলেই একটু অদ্ভুত! অনেক মুভির শেষ এক মিনিট দেখেও আমি অনুপ্রাণিত হই, আবার অনেক মুভির পুরোটা দেখেও আমার সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু মনে হয় না।

এই টাইটানিক মুভিতে একটা অংশ ছিল যেখানে একটি মেয়েকে তার মা শেখাচ্ছিল—কী করে একজন 'লেডি'র মতো আচরণ করতে হয়। পোশাক থেকে শুরু করে কথাবার্তা ও আচরণে একটা নিখুঁত মেকিভাব সৃষ্টি করতে পারাটাই হলো 'লেডি' হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই দৃশ্য দেখে নায়িকা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। কেন যেন এই এক জায়গায় এসে নায়িকার অনুভূতিগুলোর বহিঃপ্রকাশ আমার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেল। মানলাম, অনেক সময় সামাজিক প্রয়োজনে আমাদের অনেক ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু তার তো একটা মাত্রা আছে। একটা মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তা-ই করবে যা অন্যরা তার কাছে আশা করবে, একটি মুহূর্তের জন্যও সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে না, মনের মতো হাসতে পারবে না, কাঁদতে পারবে না- এটা কি একটা জীবন হতে পারে?

নাটকে সিনেমায় বইয়ের পাতায় যেসব আদর্শ মেয়েদের ছবি উঠে আসে তারা সারাক্ষণ প্রজাপতির মতো নেচে গেয়ে হাসিমুখে সেবা দিয়ে যায়। তাদের কোনো দুঃখ তারা কাউকে বুঝতে দেয় না, রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করে না, শতকথায় রা করে না। আমি কখনো তাদের মতো হতে চাইনি। হওয়া সম্ভব বা উচিত বলে আমার কখনো মনে হয়নি। একটা মানুষ যেমন অন্যের সেবা করবে, ঠিক সেভাবে সেবা পাওয়ার অধিকারও তার থাকতে হবে। কখনো সে ক্লান্ত হবে, কখনো তার মন খারাপ হবে, কখনো সে রাগ করবে, চেঁচামেচি করবে। আমরা যদি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেই 'nobody is perfect' তবে তাকে কেন নিখুঁত হতে হবে? মেয়ে বলে সে মন খারাপ করতে পারবে না? মন খারাপ করার দোষে তাকে 'আঁধারমুখো' বা 'বদমেজাজি' না বলে কেউ কি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে পারে না, 'মন খারাপ কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে?' সবসময় রাগ চেপে রেখে নিজেই কষ্ট পেতে হবে কেন? কখনো কখনো কি সে রাগ প্রকাশ করলে তাকে 'মাথাগরম' বা 'বদরাগি' খেতাব না দিয়ে ভয় পাওয়ার অভিনয় করে বলা যায় না, 'ঠিক আছে বাপু, তোমার চা বানানোর দরকার নেই, আমিই বানিয়ে নিচ্ছি?' কেন তার প্রতি অন্যায় করা হলে সে বলতে পারবে না, 'তোমরা আমার প্রতি অন্যায় করছ?' কেন সে কোনো ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? যার ওপর সবার অধিকার আছে, তার কি কারও ওপর কোনো অধিকার নেই?

খুব সাধারণ সব ব্যাপারে মেয়েদের খুঁত ধরা হয়। 'মেয়েদের খেতে এত সময় লাগলে হয়? তুমি এত আস্তে খাও বলেই তো তুমি ঠিকমত খেতে পারো না, বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যায়। মহিলারা কি করে এত আস্তে আস্তে খায়?' কেন? একজন পুরুষের জন্য যদি বাসায় একটা কাজও না করে খাবার টেবিলে গল্প করে করে এক ঘণ্টা ধরে বিপুল পরিমাণে খাওয়াটা দোষ না হয়, তাহলে একজন মহিলা সারাদিন রান্নাবাড়া করে, ঘরের কাজ বাইরের কাজ বাচ্চা সামলে তাকে জন্তু-জানোয়ারের মতো হাপুস হুপুস করে খেতে হবে কেন? কেন সে স্বস্তিমতো খাওয়ার সময়টুকুও নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবে না? বিয়ে হলেই মেয়েদের কাছে আশা করা হয় সে তার চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলবে, অথচ একজন পুরুষ শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেলেও তার জন্য তা-ই রান্না করা চাই যা সে নিজের বাড়িতে খায়।

সন্তানসম্ভবা হলে যখন মেয়েদের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার অনেক কারণ থাকে। কিন্তু আমার খুব অদ্ভুত লাগে এই ভেবে যে, মেয়েটা যতদিন কাজ করার উপযোগী ছিল ততদিন তাকে শ্বশুরবাড়িতে রাখা হলো, আর যখন তাকে দেখাশোনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন তাকে মায়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো! বলি বাচ্চাটা কোন বাড়ির?

ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম 'হাসতে মানা'। পড়ে হাসতে হাসতে কুটিকুটি হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ এই ঘটনা যে আমার জীবনে ঘটবে তা কখনো ভাবিনি। বিদেশে বড় হওয়াতে আমাদের কখনো মেপে হাসার অভ্যাস করতে হয়নি। দেশে ফেরার পর একবার এক মামা এসেছিলেন বাসায়। মা ওনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি নাস্তা এনে দিচ্ছিলাম। সব আনা হলে মা ইশারা করে বললেন, 'টিস্যু নিয়ে এসো'। মামা বলে উঠলেন, 'না না, এত খাবার আমি এমনিতেই খেতে পারব না, আর কিছু আনার প্রয়োজন নেই।' টিস্যু পেপারকে খাবার মনে করায় মামার কথায় হাসি সামলাতে পারলাম না। মা চোখ রাঙিয়ে উঠলে হাসি আরও বেড়ে গেল। মামা মা'কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর কী হয়েছে? ও হাসছে কেন?' যেন মেয়েদের হাসি পাওয়াটা অস্বাভাবিক! মা আমাকে ভেতরে যেতে বলে মামাকে বুঝ দিলেন, 'না, ওর একটু মাথা খারাপ আছে, ও এমনিতেই হাসে।'

আর কান্না? ও জিনিস আমার দ্বারা হয় না। এটাও একটা দোষ! আমার মনে হয় কান্নাটা এক প্রকার দুর্বলতা। আমি আমার দুর্বলতা শুধু একজনের কাছেই প্রকাশ করি। বাকিদের এ ব্যাপারে জানার কোনো প্রয়োজন বা অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না। তাই মানুষের সামনে কাঁদাটা আমার জন্য প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। শুধু একদিন কেঁদেছিলাম, তাও ধরে-বেঁধে কাঁদালে যা হয়! যখন ক্যানাডা চলে আসছি আমার মহিলা সহকর্মী এবং ছাত্রীরা আমার জন্য আলাদা করে বিদায়ী অনুষ্ঠান করেছিল। আমার আট বছরের ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা জীবনে যাদের পড়িয়েছি—অনার্স, মাস্টার্স, এমবিএ, ডিপ্লোমা, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের ছাত্রীরা, আমার যেসব ছাত্রী আমার সহকর্মী হয়ে গিয়েছে, প্রায় সব ব্যাচ থেকে যারা খবর পেয়েছে সবাই এসেছিল। এই আট বছরের স্মৃতিচারণ করলেন সব ছাত্রী, শিক্ষক,

সহকর্মী—আট বছর যার সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি সেই সালমা আপার উদ্যোগে, তাঁর সাবলীল উপস্থাপনায়। তারপর যখন ছাত্রীরা কান্না শুরু করল, অনেকে রাগ করল 'ম্যাডাম কেন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?' না পারি উঠে যেতে, না পারি বসে থাকতে! এছাড়া আমি বিয়ের দিন পর্যন্ত কাঁদিনি। ছোট ভাই শাওনের ওপর রাগ খুব কাজ দিয়েছিল তখন। ছেলেরা কেন মেয়েদের হলের ভেতরে আসার চেষ্টা করছে, ও কী করছে—এসব নিয়ে বকাবকি করতে করতে কেটে গিয়েছে দেড়-দু'ঘণ্টা। কিন্তু পরে এই নিয়ে কত কথা! 'বউ তো খুশি হয়ে নাচতে নাচতে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। একটু কাঁদলোও না!' মনে হলো বলি, 'বাসা থেকে আসার আগে আপনাদের সবাইকে আমার সাথে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল।' কিন্তু ভদ্রতা একটা বিরাট সমস্যা। অনেক কথাই বলা যায় না। আর মানুষ যখন এই ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করে তখন যে কী ইচ্ছে করে তা আর নাই-বা বললাম।

যে মেয়েরা খুব বেড়াতে পছন্দ করে তাদের জন্য টাইটেল হলো 'ঠ্যাং লম্বা'। আমার সবসময় বেড়ানোর খুব শখ ছিল। তাই ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। বিয়ের আগে প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ছিল বান্দরবান। ওখানে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, চিম্বুক পাহাড়ের ওপর একটা কাঁঠালচাঁপার গাছ ছিল, যে গাছের ওপর উঠলে রুমা থেকে সাতকানিয়া পর্যন্ত দেখা যেত। গাছটা পাহাড়ের এক প্রান্তে প্রায় ঝুলে আছে, তাই দৃষ্টিসীমা ছিল অবারিত। চিম্বুক গেলেই আমি ওই গাছের ওপর উঠে বসে থাকতাম। আর আমার খালাতো ভাই, যে আমার জন্মের বহু আগে থেকেই আমরা বাংলাদেশে এলে মা'র সাথে সাথে থাকে, অনবরত চেঁচাতে থাকত, 'এই, মেয়েরা গাছে ওঠো না, নাম নাম!' সমস্যা কি বুঝলাম না! কিন্তু, আমিও কম ত্যাড়া না। আমি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর থাকতাম ততক্ষণ ওই গাছের ওপরেই থাকতাম। মজার ঘটনা হলো, বাবা একবার আমার একটা ছবি তুললো ওই গাছের মগডালে বসা অবস্থায়। বান্দরবান থেকে এসে অনেক ছবির সাথে ওই ছবিটাও নিয়ে গিয়েছিলাম আমার প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সহকর্মীদের দেখাতে। ওখান থেকে ছবিটা কীভাবে যেন 'মিসিং' হয়ে যায়। আমার বিয়ের পর ওই ছবিটা পেলাম আমার শ্বশুরবাড়ির অ্যালবামে! আম্মা এই ছবি দেখে বধূ নির্বাচন করেছেন! সাহসী শাশুড়ি বটে!

মেয়েদের চিন্তা-চেতনা ভাবনা হতে হবে পানির মতো তরল, আর না হলেই সে হয়ে যাবে 'পেঁচী' বা 'পাগল'। একবার একজন আমাকে অস্থির হয়ে বলেছিল, 'আমি আপনাকে বুঝি না। কখনো মনে হয় আপনি তুলার মতো নরম, আর কখনো মনে হয় আপনি লোহার চেয়েও শক্ত!' এটা কোনো কঠিন সমস্যা নয়। আমি অন্যের কষ্টের ব্যাপারে তুলার মতো নরম, নিজের কষ্টের ব্যাপারে লোহার চেয়েও শক্ত; নিজের অধিকারের ব্যাপারে আমি তুলার চেয়েও নরম, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে আমি লোহার চেয়েও শক্ত। আমি মহান বলে নয়। আমার অধিকারের ব্যাপারে আমাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তাই এতে ছাড় দেওয়া যায়। কিন্তু আমি অন্যের প্রতি অন্যায় হতে দেখেও যদি চুপ থাকি তাহলে আমি কি মানুষ হলাম? আর এ নিয়ে চ্যাঁচামেচি করি দেখে কত মানুষ যে আমাকে অপছন্দ করে তার সীমাসংখ্যা নেই।

অনেক ব্যাপারে আমাদের দিয়ে এমন কাজ করানো হয় যার কোনো যুক্তি নেই। আমি যে দোকান থেকে সোনার জিনিস কিনতাম তাদের কাছে একবার চেইন কিনতে গেলাম আমার ননদের মেয়ে আর আমার মেয়ের জন্য। ওরা দু'রকম চেইন দেখাল—একটা চিকন, মনে হয় এখনি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে; আরেকটা মোটা, মজবুত। বললাম, দ্বিতীয়টা থেকে দু'টো দিতে। উনি একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ভাবী কি তিনটা চেইন নিচ্ছেন নাকি?' আমি ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'না তো ভাই! দু'টোই তো নেব—আমার মেয়ের একটা আর ননদের মেয়ের একটা!' উনি বললেন, 'সবাই তো নিজের জন্য মোটা নেয় আর উপহার দেওয়ার জন্য চিকন নেয়, তাই আপনাকে দু'রকম দেখালাম!' আমি থ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। রাসূল (সা.) বলেছেন বাসায় কাজের লোককেও তাই খেতে পরতে দিতে, যা আমরা নিজের জন্য পছন্দ করি। সেটা সাধ্যে না কুলালে অন্তত দূরত্বটা কাছাকাছি রাখা উচিত। কিন্তু নিজের জন্য ভালোটা নিয়ে অন্যকে খারাপটা দিলে, দেওয়ার দরকার কি? কর্তার পয়সা বাঁচাতে গিয়ে এই সাধারণ ইনসাফের ব্যাপারটাই আমরা অনেক সময় মনে রাখি না! সোনার জিনিসই দিতে হবে কথা নেই, তবে সামর্থ্যের মধ্যে ভালো জিনিসটা অন্যের জন্য নির্বাচন করাটা তো স্বাভাবিক মানবতার দাবি!

আমার ছেলেকে যে মেয়েটা দেখাশোনা করত ওর নাম ছিল রোজিনা। ওরা আট বোন। বাপের সামর্থ্য বলতে কিছুই ছিল না। তাই এক বড়লোকের ছেলের প্রস্তাব পেয়ে, মেয়ে ভালো থাকবে ভেবে উনি রোজিনার বিয়ে দিলেন এক বদ্ধ পাগলের সাথে। ওই ঘরে একটা ছেলে হবার পর ও আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, ছেলেকে বড় বোনের কাছে রেখে সুদূর যশোর থেকে চট্টগ্রামে চলে এলো। বাপের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য ছোট আরও দু'বোনকে সে নিজের কাছে নিয়ে এলো। লেখাপড়া জানত না বলে গার্মেন্টসেও চাকরি পাচ্ছিল না। চারটা বাসায় কাজ করে সে নিজে চলত, বোনদেরও পেট চালাত। বোনেরা যৎসামান্য লেখাপড়া পুঁজি করে তখন মাত্র গার্মেন্টসে ঢুকেছে।

আমার কাছে যখন সে আসে তখন আমি ছেলের জন্য ম্যাটার্নিটি লিভে। আমার বাসাটা ছিল তার পঞ্চম ছুটা বাসা। আমি ওকে বললাম, 'তুমি কি লেখাপড়া শিখলে ভালো চাকরি পাবে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তখন আমি তাকে বললাম, যখন সে ফ্রি থাকে তখন যেন আমার কাছে পড়তে আসে। একসময় খেয়াল করলাম আমার ছেলে তাকে খুব পছন্দ করছে। ভাবলাম আমি যখন আবার কাজে ফিরে যাব তখন তো বাচ্চা রাখার জন্য কাউকে লাগবে, যেহেতু আমি আমার সন্তানদের আমার সাথে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যেতাম এবং ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া নিজেই তাদের দেখাশোনা করতে পছন্দ করতাম। তখন বললাম, 'এতগুলো বাসায় কাজ না করে তুমি আমার বাচ্চাকে দেখাশোনা করো। আমি তোমাকে বেতন পুষিয়ে দেব, থাকা-খাওয়ার পয়সা বেঁচে যাবে, লেখাপড়াও শিখতে পারবে।' তখন সে রাজি হয়ে গেল। আমার খারাপ লাগত যে, নিজের ছেলেকে বোনের কাছে ফেলে এসে সে আমার ছেলেকে নিয়ে থাকে। তাই রোজিনাকে আমি সবসময় চেষ্টা করতাম সবচেয়ে ভালো কিছু দিতে যেহেতু আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা আমি ওর কাছে রাখি। অথচ এটাকে সবাই পাগলামি মনে করত। বলত, কাজের লোকজনকে এত লাই দিতে নেই।

একবার রোজিনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওর মা-বোনদের জন্য শাড়ি কিনতে। ওরা যে তিন বোন চট্টগ্রামে ছিল আর সবচেয়ে ছোট যে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত তাদের কাপড় আমি দিয়েছি। ওর মা আর বাকি চার

বোনের জন্য বাজেট ছিল এই তিন বোনের। তাই ওকে ওয়্যারহাউজে নিয়ে গেলাম অল্প দামে যাতে ভালো কাপড় পাওয়া যায়। দোকানি জানেন আমি শাড়ি পরি না। তাই শাড়ি কেনা হবে এই খুশিতে উনি শুধু দামি দামি শাড়ি বের করছেন। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ভাই, শাড়ি আমি কিনব না, উনি কিনবেন। আপনি আরেকটু কম দামের শাড়ি দেখান।' দোকানি বললেন, 'উনি কি আপনার আই.আই.ইউ.সি.'র কলিগ?' তখন বুঝলাম ঘটনা কি। রোজিনাকে আমি যে বোরকা বানিয়ে দিয়েছি তার দাম ছিল আমার বোরকার চাইতে বেশি, সে আপার সাথে বাইরে যাচ্ছে এই খুশিতে সেই দামি বোরকাটা পরে এসেছে। তাই দোকানি ধরে নিয়েছেন আজকে হেভী বাজেটে কাপড় কেনা হবে! বহুকষ্টে দোকানির বিরস চেহারা উপেক্ষা করে বাজেটের মধ্যে শাড়ি কিনে বের হয়ে আসতে পেরেছিলাম!

বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই পড়তাম, 'মেয়েমানুষ ছেলে ঠ্যাঙ্গাবে, পরের বদনাম করবে—তার আবার লেখাপড়ার কী দরকার?' এটা যে সত্যি সত্যি কেউ অনুসরণ করতে পারে তা কখনো ভাবিনি। আমি যখন কোনো বইয়ের মধ্যে হারিয়ে যাই তখন আমার ঘর-বাড়ির অবস্থা মনে থাকে না, কোনোক্রমে বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া ঠিক থাকলে আর নিজের খাবারের চিন্তাও মাথায় থাকে না। একবার এক ব্যক্তি আমাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এক ভদ্রমহিলার উদাহরণ দিলেন, যিনি ভারী যত্নের সাথে ঘরবাড়ি, সংসার, সন্তানদের ঝকঝকে তকতকে করে রাখেন। আমি নিজেই বলব আমি ভালো গৃহিণী নই। সুতরাং, আমার 'ইম্প্রেসড' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না হয়তো যে, সেই একই ভদ্রমহিলা গাঁটের পয়সা খরচ করে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন পরিবারে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সময়, শ্রম এবং মেধা ব্যয় করতেন। অন্যের সংসারে সম্পর্কের কলি প্রস্ফুটিত করার পরিবর্তে তাতে বিষ ঢেলে দিতেন। আমার মাথায় শুধু এটাই কাজ করত, যে মহিলার মন এত অপরিস্কার তার ঘর পরিস্কার রেখে কী লাভ? যে অন্যের ঘরে সম্প্রীতি আর বিশ্বাসের বীজ জেগে উঠতে না উঠতেই আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সে নিজের জন্য কী করে সুখের স্বপ্ন দেখতে পারে? এসব দেখে আমি দু'আ করতাম আমি কারও সাথে সজ্ঞানে এমন আচরণ করার আগে যেন আল্লাহ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যান।

যা-ই হোক। সবদিক বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, আমি 'লেডি' বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত নই। তাই আমার জীবনের নিম্নোক্ত ঘটনা ছিল আমার কাছে অন্যতম আশ্চর্য এক ঘটনা।

'৯২ সালে আমি যখন ঢাকা থেকে দিল্লী যাচ্ছি আমার বাবা-মার সাথে মিলিত হবার জন্য, তখন আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। প্লেনে আইলের অন্যপাড়ে এক ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হলো। উনি শ্রীলঙ্কান মুসলিম। ঢাকা এসেছিলেন গার্মেন্টস সংক্রান্ত কাজে। ওনার মেয়ে আমার সমবয়সী। ওনার পাশে বসা ভদ্রলোক দিল্লীর মুসলিম পরিবারের ছেলে, ঢাকা শেরাটনে বারে কাজ করেন, বিয়ে করতে দেশে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রতি বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। কিন্তু প্রথম ভদ্রলোকের সাথে নানান বিষয়ে কথা হলো পুরো পথ। আমাদের দু'দেশের এডুকেশন সিস্টেম, দু'দেশের মেয়েদের বেড়ে ওঠা, আমাদের চোখে দু'দেশের জনগোষ্ঠী, আরও অনেক কিছু। বিমানবন্দরে নামার কিছু আগে খুব 'টার্বুলেন্স' শুরু হলো। বিমান কাঁপতে শুরু করল, হুলুস্থূল আর শব্দের জন্য শোনা মুশকিল হয়ে পড়ল। উনি কী যেন বললেন, আমিও হেসে মাথা নাড়ালাম, 'ঠিক, ঠিক।' ভাবলাম উনি নিশ্চয়ই টার্বুলেন্স বিষয়ক কোনো কথা বলছেন। কিছুক্ষণ পর অবস্থা স্বাভাবিক হলে উনি বললেন, 'তুমি কি শুনেছ আমি কী বলেছি?' বললাম, 'হ্যাঁ, শুনব না কেন?' তখন আমি নামার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমার একটাই ব্যাগ কিন্তু বইপত্রের কারণে অনেক ভারী। কীভাবে নেব বুঝে পাচ্ছি না। উনি বললেন, 'তুমি শোননি।' আমি হালকাভাবে বললাম, 'বলেন আপনি কী বলেছেন?' উনি বললেন, 'আমি বলেছি, যে ছেলে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।' আমি যদি ফর্সা হতাম আমার গাল তখন আগুনের মতো লাল হয়ে যেত। কিন্তু উনি বাবা, বুঝতে পারলেন। ওনার সফরসঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে একজন লেডি আছে, চলো ওর ব্যাগটা আমরা চেক-ইন পর্যন্ত এগিয়ে দেই।'

চট্টগ্রামের পর্দানশীন বোনেরা

আমাদের দেশে প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে, সিলেট এবং চট্টগ্রামের লোকজন অপেক্ষাকৃত ধার্মিক হয়ে থাকে। হয়তো যারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন তাঁদের অনেকের ঘাঁটি এসব অঞ্চলে ছিল বিধায় এ অঞ্চলের লোকজন ধর্মের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়ে থাকবে বলে আশা করেই এমন ধারণা করা হয়ে থাকে। এই অনুমান কতটা সঠিক কতটা বেঠিক সে হিসেবে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। চট্টগ্রাম আমার জন্মস্থান এবং জীবনের একটা অংশ এখানে কাটিয়েছি আমি। সে হিসেবে আমার বোনদের মধ্যে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান পালন সংক্রান্ত যেসব ভুল ধারণা দেখেছি সেটা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করতে চাই।

কেউ যদি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে আমার ভুল ধরিয়ে দেন তাকে আমার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়। কেননা তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে আমাকে আমার একটি ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছেন। বোনেরা, আমি নিজেও আপনাদের একজন। তাই আপনারা আমার কথায় আহত না হয়ে যদি বোঝার চেষ্টা করেন, তবে আমরা উভয়েই উপকৃত হব।

আমি খুব একটা ইসলামিক পরিবারে জন্মাইনি। এখনো শিখছি। তবে ইসলামের দিকে এগোতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, ইসলামের মৌলিক নিয়মগুলোর মধ্যে যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয় তা হলো পর্দা। আমরা অনেকেই জানি না যে, নামাজ বা রোজার

মতো পর্দাও পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ফরজ। অনেক মানুষ এখনো মনে করে পর্দা একটি অপশনাল ব্যাপার এবং এটি শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য। অনেকের ধারণা পর্দা মানে শুধু একপ্রস্থ কাপড়। কিন্তু পর্দা মানে যে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সৌন্দর্যের প্রদর্শন পর্যন্ত সবকিছুতে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা—সেটা যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছি সেদিন থেকে আমি একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। সুকুমার রায়ের কবিতায় "নিয়মছাড়া হিসাবহীন" বাক্যাংশটি পড়তে যত ভালো লাগে, আসলে কিন্তু অনিয়মের মধ্যে তেমন ভালো কিছু পাবার নেই।

আমি ফাকীহ (ইসলামি আইনজ্ঞ) নই। সুতরাং পর্দাসংক্রান্ত ফিক্‌হের আলোচনায় যাবো না। আমি সহজ ভাষায় যতটুকু বুঝি, পর্দা বলতে বোঝানো হয়েছে এমন পোশাক যা শরীরের রঙ এবং আকৃতিকে ঢেকে রাখে এবং এমন আচরণ যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে মানুষকে নিরাপদ রাখে। নারীদের আল্লাহ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের চুল থেকে নখ পর্যন্ত সবই আকর্ষণীয়। বিশ্বাস না হলে যেকোনো ভাষায় যেকোনো কবির প্রেমের কবিতা পড়ুন। তাই আল্লাহ তাদের শুধু মুখ এবং হাত ছাড়া বাকি সবটুকুই ঢেকে নিজেদের কেবল তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে বলেছেন যারা অবিসংবাদিতভাবে মেয়েটির ভালো চায় বা অন্তত ক্ষতি চায় না। পুরুষদের যেহেতু আল্লাহ ভারী কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাদের এমন আহামরি কোনো সৌন্দর্য দেননি; সুতরাং তাদের জন্য শারীরিক পর্দার পরিধিও অনেক কম করে দিয়েছেন। আচরণের দিক থেকে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ কম বিধায় তাদের জন্য পর্দা অনেক বেশি কঠোর করে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি থেকে শুরু করে বাড়িতে প্রবেশ পর্যন্ত সর্বত্র তাদের সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকে মেয়েদের কোমল স্বরে অপ্রয়োজনীয় গল্প-গুজব থেকে বিরত থাকা ছাড়া আর তেমন কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। কথাবার্তা কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে কী কী হয় তা নিয়েই পৃথিবীর তাবৎ নাটক, সিনেমা, উপন্যাস রচনা করা হয়। আর সেগুলো পড়ে পাঠক চোখের জল ফেলেন; যাকে এই বেদনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় তার কথা তো বাদই দিলাম।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা আবুধাবী থেকে দেশে ফিরে আসি ১৯৮৯ সালে। চট্টগ্রামে থাকতে আসি ১৯৯০ সালে। ছুটিতে এলে মূলত ঢাকায় থাকা হতো, তাই চট্টগ্রাম তেমন পরিচিত ছিল না। জন্মস্থানের সাথে পরিচিত হতে গিয়ে কিছু কিছু জিনিস দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাই। আবুধাবীতে দেখতাম যারা পর্দা করতেন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে করতেন, আর যারা করতেন না তারা করতেনই না। চট্টগ্রাম এসে প্রথম দেখলাম মহিলারা বোরকা পরে হাঁটছেন কিন্তু তাদের মাথার কাপড় গলায় পেঁচানো! মাথাও ঢাকছে না, শরীরও ঢাকছে না! তাঁরা কখনো সেই স্বচ্ছ ওড়না তুলে আধামাথায় দিচ্ছেন, আবার কখনো সবার সামনে ওড়না খুলে চুল ঠিক করছেন। আমি বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। যাদের দেখে আমি নিজেই হতবাক, স্বাভাবিকভাবেই তাদের দেখে আমার বাবা-মাকে বোঝানো কঠিন আমি কেন পর্দা করতে চাই।

কলেজে যাওয়া শুরু করার পর দেখতে পেলাম অনেক মেয়েরা পরিবারের চাপে বাসা থেকে বোরকা পরে বেরোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কিছু দূর এসে বোরকা খুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখছে; আর শুধু অ্যাপ্রন পরে কলেজে আসছে! আরেকবার চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে এক অসাধারণ সুন্দরীকে দেখলাম। তাকে শ্বশুরবাড়ির সবাই বিদায় জানাতে এসেছে। প্লেনে উঠামাত্র দেখি তিনি বোরকা স্কার্ফ সব খুলে ফেললেন, পাশে বসা স্বামী নির্বিকার! আমার খুব মায়া লাগত ওদের জন্য। ওদের বাবা-মা সমাজ ওদের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো করে পর্দা চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এর কী প্রয়োজন বা কেন করতে হবে তা তাঁরা নিজেরাই জানে না। এটা তাঁদের কাছে একটা ফ্যামিলি ট্রেডিশন বৈ কিছুই নয়। যা তারা বোঝে না তা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে মেয়েরাই বা কী করে মেনে নেবে? আমার খুব দুঃখ হতো। ওরা পর্দা করার সুযোগ পেয়েও খুলে ফেলছে, আর আমি করতে চাইছি কিন্তু এই নিয়ে আমার পরিবার আমার ওপর বিরক্ত!

চট্টগ্রামে একটা ট্র্যাডিশন আমার ভীষণ খারাপ লাগে। অনেক মেয়েরা বাইরে পর্দা করলেও ঘরে নির্দ্বিধায় অন্য পুরুষদের সামনে বেপর্দা অবস্থায় চলে যায়। এ ব্যাপারটা যে কত হাস্যকর তা কারও মাথায়ই আসে না! যদি পর্দার উদ্দেশ্য হয় পরপুরুষের কাছ থেকে নিজের সৌন্দর্য গোপন করা,

তাহলে তার সামনে এই সৌন্দর্য এক জায়গায় গোপন এবং আরেক জায়গায় প্রকাশ করলে কী লাভ?

আরেকটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বেপর্দা হয়ে ছবি তোলা! যে মেয়েটি পর্দা করে সেও বেপর্দা হয়ে ছবি তোলে এবং আজকাল ফেসবুকের কৃপায় সে ছবি সবাই দেখতে পায়। ক্যানাডায় আসার জন্য যখন ছবি তুলতে গেলাম ক্যামেরাম্যান খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'আপনি ওড়না খুলে ফেলেন'। আমি হাঁ করে তাকিয়ে বললাম, 'মানে'? সে বলল, 'মাথায় কাপড় দেওয়া ছবি হলে আপনি ক্যানাডায় যেতে পারবেন না।' আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল, বললাম 'আপনার কাজ ছবি তোলা, আপনি ছবি তোলেন। ক্যানাডার সরকার আমাকে মাথায় কাপড় দিলে নেবে কি নেবে না আপনার চিন্তা করতে হবে না। না নিলেও সমস্যা নাই, ক্যানাডায় না গেলে আমার বেহেস্তের টিকেট ক্যান্সেল হয়ে যাবে না।'

আজকাল যেসব ফ্যাশন বেরোচ্ছে তাতে মনে হয় কাপড় কম পড়েছিল বিধায় জামা টাইট এবং সালোয়ার ছোট হয়ে গিয়েছে, আর ওড়নার প্রস্থ চিমসে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে লেটেস্ট ডিজাইনের জামা পরতে হবে বলে তো কোনো কথা নেই! আমার এক বান্ধবী আজীবন কেবল পাঞ্জাবী স্টাইল পরল। সে পর্দা করে না, কিন্তু সে মনে করে তাকে এই ডিজাইনেই সবচেয়ে ভালো লাগে। তাহলে আমাদের কেন এমন জামা পরতে হবে যাতে পর্দা তো দূরের কথা, ন্যূনতম ভদ্রতা পর্যন্ত বজায় থাকে না? ভীষণ আশ্চর্য একটা ঘটনা হলো অনেকে হাফহাতা জামা পরে তার সাথে স্কার্ফ পরে; অনেকে বোরকা পরে এত টাইট যে, মনে হয় এর চেয়ে শুধু জামা পরলেই ভালো হতো। অনেকের পোশাক ঠিক থাকলেও আচরণে পর্দার লেশমাত্র থাকে না। যেহেতু হাতের কবজি পর্যন্ত পর্দার অন্তর্ভুক্ত, হাফহাতা জামা পরলে সাথে স্কার্ফ পরলেও পর্দার শর্ত পূরণ হয় না। বোরকার উদ্দেশ্য যেহেতু শরীরের আকার বোঝা না যাওয়া, টাইট বোরকা পরলে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। আর আচরণে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কেবল একপ্রস্থ কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে নিরাপত্তা পাওয়ার আশা দুরূহ।

একবার বাণিজ্যমেলায় গিয়েছি। আমার মেয়ের জন্য ক্লিপ কিনছিলাম। আমরা আই.আই.ইউ.সি.'র সব মহিলা সহকর্মীরা একসাথে যেতাম ভর

দুপুরে, যখন মেলা ফাঁকা থাকত। ক্লিপের দোকানে ঢুকে বাচ্চাদের ক্লিপ দেখছি, এমন সময় দেখি এক বোরকাপরা মহিলা ঢুকলেন, কয়েকটা চুলের কাঁটা বেছে নিলেন, তারপর মাথার ওড়না খুলে একটা একটা করে কাঁটা মাথায় লাগিয়ে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তাকে দেখতে কেমন লাগছে! আমার চেহারা দেখে ফাহমিদা আমাকে টেনে নিয়ে গেল, 'আপা, অন্য দোকানে চলেন।'

সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায় বিয়েবাড়িতে। যে কারণে আমি আমার নিজের বিয়ের সময় পর্যন্ত বিয়েবাড়িতে যেতে চাইনি। এক এক জনের সাজপোশাক দেখে আমি আর কিছুতেই তাদের চিনতে পারি না। এক বিয়েতে আমার এক ছাত্রীর মাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ছাত্রী আসেনি?' উনি বললেন, 'ওইতো বউয়ের পাশে! আপনি ওকে দেখতে পাচ্ছেন না?' ছাত্রী ইউনিভার্সিটিতে বোরকা পরে আসে। আমি বউয়ের আশেপাশে কোনো ওড়না পরা মেয়েও দেখছিলাম না। আমার বিহ্বল চেহারা দেখে উনি বললেন, 'ওই যে লাল লেহেঙ্গা পরা!' এবার দেখতে পেলাম, কিন্তু একনজর দেখেই আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। বোরকা কোথায়? সে পরে এসেছে হিন্দি সিনেমার মহিলাদের মতো ছোট্ট একটা ব্লাউজ একখানা স্কার্টের সাথে, ঘাড় থেকে একপাশে ঝুলানো ওড়না, মধ্যাঞ্চল সর্বসাধারণের দৃষ্টির সমক্ষে উন্মুক্ত! মনে মনে ধিক্কার দিলাম ওর মাকে যিনি এই বৃদ্ধ বয়সে বোরকা পরে এসেছেন, উনি এখন পর্দা না করলেও ওনার দিকে কেউ তাকাবে না। অথচ যে মেয়েকে উনি বোরকা পরে ইউনিভার্সিটি পাঠান তাকে তিনি অর্ধনগ্ন করে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ তাকে দেখছে! এটা বিয়েবাড়ির সচরাচর ঘটনা। অনেক বয়স্কা মহিলারা পর্যন্ত বিয়েবাড়িতে গেলে বোরকা খুলে মাথার কাপড় ফেলে দেন। আর গহনার পরিমাণ এবং আকারের প্রতিযোগিতায় পর্দা যে কোথায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় তা ছাড়া আর কিছু যেন তখন কারও মাথায় থাকে না। পর্দার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয় তবে বিয়েবাড়ির এই প্রতিযোগিতাকে জ্ঞানের অভাব ছাড়া আর কী বলব?

পুরুষ সহকর্মীদের অনেকেই দুঃখ করতেন যে, তাদের স্ত্রীদের এক এক বিয়েতে সাজার জন্য পার্লারের খরচ দিতে তাদের মাসের খরচ ব্যয় হয়ে যেত! প্রত্যেক অনুষ্ঠানের জন্য নতুন নতুন শাড়ি আর গহনার সেট চাই। দাওয়াত পেলেই বেচারাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত!

পুরুষদের ব্যাপারেও বলতে হয়, তারা চোখের পর্দা করার ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন। বিশ্বাস না হয় দেখুন, প্রত্যেক বিয়েবাড়িতে মেয়েদের হলে ঢোকার জন্য পুরুষরা কীভাবে লাইন দেন। যেখানে বলা হয়েছে নিজের ঘরে পর্যন্ত প্রবেশ করার সময় নক করতে সেখানে চট্টগ্রামে খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুপাতো ভাই, চাচাতো ভাইরা বোনদের রুমে নক না করেই ঢুকে পড়ে যখন তখন। যেন এটা তাদের জন্মগত অধিকার! তাদের সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা না করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে তাদের ঘরে। নতুবা রান্নাঘরে বসে বসে গল্প করে। অথচ মেয়েদের রান্নাঘরে কাজ করার সময় পর্দা বজায় রাখা কতটা কঠিন ব্যাপার তা নিশ্চয় সবাই জানেন। হাসপাতালে সদ্যপ্রসূতির রুমে বসে থাকা পুরুষ আত্মীয়দের দেখুন, যাদের নতুন মায়েরা না চলে যেতে বলতে পারেন, না পারেন সঠিকভাবে বিশ্রাম নিতে।

এক বান্ধবীর বিয়ের ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওর দু'পাশে, সামনে পেছনে ওর স্বামীর সব বন্ধুরা বসে ছবি তুলেছে, স্বামী ভদ্রলোক ছবিতেই নেই! ওর স্বামী এর মাধ্যমে কি ধরনের আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিলেন কিংবা স্ত্রীর সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কতটুকু সম্মান দেখালেন?

এমন আরও অনেক সমস্যা দেখা যায়, যার মূলে রয়েছে জ্ঞানের অভাব। আমি চট্টগ্রামের পর্দার ট্র্যাডিশন সম্পর্কে বললেও সবাই বলেন, এই জাতীয় সমস্যা নাকি বাংলাদেশের কমবেশি সব অঞ্চলেই দেখা যায়। আমরা যদি ট্রেডিশন মনে না করে একে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করি এবং এব্যাপারে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করি, যা শিখলাম সে অনুযায়ী পালন করি, তাহলে এসব ভুল বুঝাবুঝির অবসান হতে পারে। আমি নিজে নিখুঁত নই, তাই অন্যের ভুল ধরতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, যা করব তা সঠিকভাবে জেনেবুঝে করা উচিত, যেন আমার ভুলের কারণে আরেক জনের মধ্যে কোনোপ্রকার অহেতুক সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি না হয়।

নট ফর সেল

আমার ক্যানাডিয়ান নওমুসলিমা ছাত্রী আয়শা; বয়স ১৯, পরির মতো সুন্দরী; আমার কাছে আরবি পড়া শেখার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনে নেয়।

ওর সাথে পরিচয় এই রমাদানে। সেদিন ইফতার পার্টি ছিল, রাতে কিয়ামুল লাইল। ইফতারের পর আমরা পাশাপাশি নামাজে দাঁড়ালাম। সামনে, পেছনে, পাশে এত মহিলা এবং বাচ্চারা গিজগিজ করছে যে, নামাজে মনোযোগ ধরে রাখা যুদ্ধসম কঠিন ব্যাপার। লক্ষ্য করলাম এর মাঝেই সে একমনে স্রষ্টার সাথে বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ময়দানে সে যেন একাই দাঁড়িয়ে! জানতে পারলাম পাঁচ ওয়াক্তের পাশাপাশি সে এমন অনেক নফল সলাত আদায় করে যার নামও অনেক জন্মগত মুসলিমের অজানা।

ইসলামের প্রতি ওর আগ্রহ আমাকে চমৎকৃত করল। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র দু'বছর। কিন্তু সে তার ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক; ফলে সে এর সবটুকুই পালন করতে আগ্রহী এবং যত্নশীল। দেখলাম সে এর মাঝেই ভারী সুন্দর বোরকা এবং স্কার্ফের কালেকশন করে নিয়েছে। ওর পোশাক-আশাক থেকে সবকিছুতে রুচিশীলতার ছাপ রয়েছে। তবে এর সবটুকুই ইসলামের দৃষ্টিতে যতটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিবেচনা মাথায় রেখে। যেমন, ক্যানাডায় নেইল পলিশ ছাড়া কোনো স্টাইলিশ মেয়ের দেখা পাওয়া

অস্বাভাবিক, কিন্তু ওর হাতে-পায়ে কোথাও নেইল পলিশ নেই। স্কার্ফ বা ওড়না যখন যা-ই পরে একটি চুলও কোনোদিন বেরিয়ে থাকতে দেখিনি।

রাতে কুর'আনের আলোচনার সময় বাংলায় আলোচনা হওয়ায় বেচারি বুঝতে পারছিল না। আমি তখন ওর আগ্রহ দেখে কিছু অংশ মুখে এবং কিছু অংশ লিখে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। সে কৃতজ্ঞচিত্তে সব শুষে নিতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে সঠিকভাবে বুঝে নিল। যখন আলোচনা শেষে নামাজ শুরু হবে, সে এসে আমাকে বলল, 'আমি কি আপনার পাশে দাঁড়াতে পারি? তাহলে আমি আপনাকে দেখে আমার postureগুলো ঠিক হচ্ছে কি না যাচাই করে নিতে পারব।' আমি তো হতবাক! অনেক সময় অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ করে রুকু এবং সিজদায় postureএর ভুলের ব্যাপারে বলতে গিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আর সে কিনা বলে নামাজ সঠিকভাবে পড়ার জন্য posture ঝালাই করে নেবে! ওর আগ্রহ আবারও আমাকে চমৎকৃত করল।

এর পর থেকে কুর'আনের ওয়েবলিঙ্ক নেওয়া থেকে শুরু করে ভ্রূ তোলার মাসআলা পর্যন্ত নানান বিষয়ে ওর সাথে আলাপ হয়েছে। ভালো লেগেছে যে, সে কোনো বিষয়ে জানার সাথে সাথে তা গ্রহণ করেছে, কুতর্কের আশ্রয় নেয়নি। অথচ এতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সকল হুকুম আহকাম আঁকড়ে ধরার আগ্রহ অনেক ইসলাম জানা মানুষের মাঝেও দেখা যায় না!

ক'দিন আগে নতুন করে ওর ইসলামের বোধ এবং অনুভূতির পরিচয় পেয়ে আবারও মুগ্ধ হলাম। ক্যানাডার একটি বৃহৎ ফ্যাশন হাউজ একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করছে। এক পর্বে সমাপ্য শোটিতে মডেলিং করার জন্য ওকে ৪০,০০০ ক্যানাডিয়ান ডলার অফার করা হয়। সে সরাসরি না করে দেয় এই বলে, 'আমার ধর্ম আমাকে নিজেকে পুঁজি করার অনুমতি দেয় না।' শুনে এত ভালো লাগল! মনে হলো, এই মেয়েটি খানিকটা দেরিতে ইসলামকে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু সে-ই তো পেয়েছে এর আসল স্বাদ! দোকানে, লাইব্রেরিতে, মসজিদে ওর মতো এমন আরও অনেক নওমুসলিমা বোনকে দেখে আনন্দিত হই, আশা জাগে ইসলামের সম্ভাবনাময়

ভবিষ্যৎ নিয়ে। আবার ভয় হয় আমরা যারা জন্মগতভাবে একে পেয়েও হেলায় হারাচ্ছি তারা বুঝি আবার অপাংক্তেয় হয়ে পড়ি!

ওজন বিড়ম্বনা

কদিন ধরেই হাফিজ সাহেব আমাকে ক্ষেপাচ্ছেন। কে যেন ওনাকে বলেছে, 'হাফিজ ভাই, আপনার বউটা বেশি শুকনা, একদম বেশি, বেএএএশি শুকনা!'

সমস্ত দোষ সেই দীঘলদেহী ক্ষীণকায় ভদ্রলোকের, যিনি কয়েকশ' বছর আগে পৃথিবীর এত এত জায়গা থাকতে মাতৃভূমি ইরাক ছেড়ে এসে পৌঁছেছিলেন এই সুগোল, সুডৌল, সুস্বাস্থ্যবান মানুষের দেশে। যখন তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য একটি সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন ছাড়া তেমন খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু অন্যায়টা করে বসলেন যখন তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিড়ম্বনার কথা না ভেবে এই দেশেই বিয়ে-শাদি করে শেকড় গেঁড়ে বসলেন। এই বিড়ম্বনা হতে মুক্তির উপায়ের অন্বেষণে আমার প্রয়াত চতুর্থ চাচা পটিয়ায় সংরক্ষিত বংশতালিকা নিয়ে গবেষণায় বসেছিলেন। তবে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন যে, সেই ভদ্রলোক নিজে 'চিকন কাজী' হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তী বংশধরদের জিন এর ভেতর দিয়ে তাঁর এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

পিতামাতা উভয় দিক থেকে এই ভদ্রলোকের বংশধর হবার কারণে উক্ত বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে প্রকটিত হয়। তাহলে এখানে আমার কী দোষ থাকতে পারে?

আমি জন্মেছিলাম অত্যন্ত ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে। জীবনে ওই একসময়ই আমার সুস্বাস্থ্যের গৌরবগাথা রচনা করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তখনো লিখতে শিখিনি, 'অ্যাঁ অ্যাঁ' ছাড়া বোধগম্য কিছু বলতেও পারতাম না। আফসোস! যতদিনে মোটামুটি বলতে, পড়তে, লিখতে পারার উপযোগী হয়েছি ততদিনে বড় দাদাজান আমার ওপর ভর করে বসেছেন। এই অবস্থা প্রথম টের পাই ডেমরা গিয়ে। ওখানে এককালে বাপজানের জমি ছিল। চাষি না হয়েও চাষাবাদের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে কেনা। তা একবার বাবা আমাকে নিয়ে ডেমরা গেলেন জমি দেখতে। তখন আমার বয়স সাত বা আট। ওখানে পৌঁছে কাকে যেন খুঁজতে গেলেন বাবা। আমাকে বলে গেলেন ছাতাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। চারপাশে ধানক্ষেত। বাতাস বইছে হু হু করে। পুরো শরীর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে বাতাসে। মনে হলো উড়ে গিয়ে জমির মাঝখানে পড়ব। ছাতার ডাণ্ডাটা মাটিতে গেঁড়ে প্রাণপণে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সত্যি সত্যি যদি উড়ে গিয়ে জমিতে পড়ি, এই ভয়ে!

আমার বয়স যখন দশ এগারো, তখন ইথিয়োপিয়াতে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে। প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুসহ অসংখ্য লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। বাহরাইনের বান্ধবী সারা উইকহাম অক্সফামের নিলামে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহের জন্য স্ট্যাম্প সংগ্রহ করছে। আমি ওর বিশিষ্ট সহযোগী। আবুধাবী বসে শত শত স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে প্রসেস করে পাঠাই ওকে। এই পরিস্থিতিতে একদিন এক দাওয়াতে বরাবরের মতোই আমি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বাবার সাথে ঝামেলা করছি, একজন আমাকে দেখে মন্তব্য করে বসল, 'কিরে ভাই, আপনার মেয়েকে দেখে তো মনে হচ্ছে ইথিয়োপিয়া থেকে এনেছেন!' ব্যাস, আমার নাম হয়ে গেল 'ইথিয়োপিয়া'! দুর্ভিক্ষ শেষ হলো একসময়, কিন্তু নাম আর পিছু ছাড়ে না।

ক্লাস নাইনে আমাদের ক্লাসে এক নতুন বান্ধবী এলো, নাম শায়লা। ক্লাসে সবাই ওকে ক্ষেপাতাম ওর সুস্বাস্থ্যের জন্য। একদিন বিকেলে শায়লা আমাকে ফোন করল, 'শোনো, আজ অনেক লোকজন বাইরে যাচ্ছে। তবে তুমি কিন্তু যেও না। গেলে আমাকে খবর দিও, আমিও তোমার সাথে যাব।'

বললাম, 'কী সুন্দর বাতাস আজকে! জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাগরপাড়ে অনেক লোকজন হাওয়া খেতে আসছে। আমরাও একটু পরে

যাব। আমাদের তো বাসার সামনে রাস্তাটা পার হলেই সমুদ্র, তুমি আবার এতদূর থেকে কষ্ট করে আসতে যাবে কেন?'

'তোমার জন্য। তুমি যদি বাতাসে উড়ে যাও! তোমাকে আমার সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাব।'

মাদ্রাজ ছিলাম চার বছর। ওখানকার লোকজনের মার্শা'আল্লাহ পিলারের মত স্বাস্থ্য, আগাগোড়া সব সমান। সারাজীবন কোনো প্রকার আমিষ স্পর্শ না করে যে ওরা কী করে এমন বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় কে জানে! প্রতিদিন প্রতিবেশীরা হা হুতাশ করতেন, 'আহারে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ!' আর আমি মনে মনে ভাবতাম, 'এমনই তো ছিলাম, শুকালাম কবে?' তবে একবার এক ঘটনায় খুব মজা পেয়েছিলাম। একদিন রাতে, আনুমানিক সাড়ে দশটা এগারোটায়, নীচতলায় প্রচণ্ড শব্দ শুনে কোনো অঘটন ভেবে আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আশেপাশের প্রতিবেশীরাও উঁকিঝুঁকি করছে। আঙ্কেল আন্টি নির্বিকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের শব্দ হলো?' তাঁরা নিষ্পাপ চেহারা করে বললেন, 'কই, আমরা তো কোনো শব্দ শুনিনি!' কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো ব্যাপারটা। পরদিন সকালে আন্টিকে তরকারী দিতে গেলে তিনি বললেন, 'শোনো, কাল রাতে এত মানুষের সামনে আর বলিনি ঘটনাটা। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে বারান্দায় এসে দেখি তোমার আঙ্কেল দোলনায় বসে হাওয়া খাচ্ছে। ভাবলাম দু'জনে একটু রোমান্টিক সময় কাটাই, পাশে এসে বসলাম একটু গল্প করার জন্য। তুমি তো দেখেছ আমরা সবাই একটু স্বাস্থ্যবান। তা আমি বসতেই দোলনাটা দড়ি ছিঁড়ে সশব্দে পড়ল। আমরা ব্যথা পেয়েছি কি না পেয়েছি সব ভুলে গিয়ে তড়িঘড়ি করে দোলনা লুকালাম কেউ দেখে ফেলার আগেই। বিশ্বাস করো, কোমরের ব্যাথায় ঘুমাতে পারিনি সারারাত। কিন্তু যখন সবাই ছুটে এলো তখন দু'জনে ভালো মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম; যেন কেউ বুঝতে না পারে।'

বাহ! এর চেয়ে আমরাই কি ভালো নেই?

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে,আমার বিয়ে হলো ঠিক আমার দ্বিগুণ ওজনের অধিকারী ব্যক্তির সাথে। ভাবলাম, 'আহা, এমন মোটা একটা লোক আমার বর!' তারপর উনি আমাকে ঢাকা নিয়ে গেলেন আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা

করতে। ওনার বিভিন্ন সম্পর্কের ভাইবোনদের দেখে মনে হলো, 'না, আমার বর বেশ শুকনা!' তা একদিন কাজ শেষে দু'জনে রিক্সায় করে বাসায় আসছি, ওই দিক থেকে দেখলাম বড় আপা রিক্সায় চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন। খানিকক্ষণ পর বড় আপা ফিরে এসে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'যাবার সময় দেখলাম হাফিজ বাসায় আসছে, তুমি কখন এলে? দু'জন একসাথে এলেই তো পারতে!'

বললাম, 'একসাথেই তো এলাম!'

উনি বললেন, 'কী বল? আমি তো রিক্সায় শুধু ওকে দেখলাম!'

আমি আস্তে করে বললাম, 'পাশে আমি ছিলাম, কিন্তু ওনার সাইজের কারণে আপনি আমাকে দেখতে পাননি...'

একবার ইন্ডিয়া বেড়াতে গেলাম। মেজ ননদও একই সময় গিয়েছে। কলকাতা নিউ মার্কেটে যাবো। ও বলল, 'ভাবী, কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো না, আপনি রাদিয়াকে আমার কাছে দিয়ে যান।' যেহেতু সাথে বাচ্চা নেই, পয়সা বাঁচানোর জন্য বাসে উঠলাম। একটু পর বাস সামান্য ঝাঁকি দিল, সবাই আলুর বস্তার মত সামান্য একটু ঝাঁকি খেয়ে আবার জায়গামতো বসে পড়ল। কিন্তু আমি চলে গেলাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাইরে। যদি বাসে ছাদ না থাকত তবে সেদিন আমি হয়তো পাখির মতো উড়ে যেতাম। পুরো বাসের যাত্রীরা হা করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি যে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করতে গিয়ে কয়েকবার ধরা খেয়ে শেষে অনেক অনুরোধ করে অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে শুরু করলাম। কোনো নতুন ব্যাচ এলে প্রথম দিন ক্লাস নিতে যাবার আগে আতঙ্কে ভুগতাম। শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে হেড স্যারকে বললাম, 'স্যার, স্টুডেন্টদের মতো শিক্ষকদেরও আই ডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হয়।'

স্যার বললেন, 'কেন?'

জানাতে বাধ্য হলাম, 'স্যার, দুই বাচ্চার মা হলাম, এখনো যদি স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাই, তুমি কোন সেমেস্টারে পড়ো?,' মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়।'

স্যার বললেন, 'রেহনুমার জন্য আইডি কার্ড তৈরির ব্যবস্থা করা হোক, 'রেহনুমা বিন্‌ত আনিস, দুই বাচ্চার মা'!'

কি আর বলব দুঃখের কথা!

ক্যানাডা এসে হাফিজ সাহেব আরও স্বাস্থ্যবান হলেন। আমার মেয়ে আমাকে ওজনে ছাড়িয়ে গেল, আমি অপরিবর্তিতই রয়ে গেলাম। কন্যা আমাকে দেখে হাসে, 'আম্মু, তুমি যাই পরো মনে হয় হ্যাঙ্গারে ঝুলছে!' কী করব? পৃথিবীর তাবৎ পোশাক মনে হয় স্বাস্থ্যবানদের মাপে বানানো হয়। যতগুলো অ্যাড দেওয়া হয় স্বাস্থ্য কমানোর জন্য তাতে মনে হয় আমি এবং আমাদের মতো লোকজন এখন একটি বিলীয়মান প্রজাতি। সে যাই হোক, আমরাও কম যাই না। আমরা যেকোনো জায়গায় বসতে পারি, যেকোনো পোশাক পরতে পারি, যেকোনো খাবার খেতে পারি এবং তারপরও রোগমুক্ত থাকতে পারি, আল-হামদু লিল্লাহ!

আমার অনেক ছাত্রী আফসোস করত যে পৃথিবী, বিশেষ করে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এবং মিডিয়া মানুষকে অসহায় করে ফেলছে। তারা একটি standard বেঁধে দিচ্ছে। আমাদের ওজন কত হওয়া উচিত, প্রতিটি অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর মাপ কেমন হওয়া উচিত, আমাদের কেমন পোশাক পরা উচিত, চেহারার মেকআপ কেমন হওয়া উচিত... সব, সবকিছু তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ প্রতিটি মানুষের গঠনশৈলী আলাদা, রুচিপছন্দ আলাদা, শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজনগুলো ভিন্ন এবং এই পার্থক্যগুলোই পৃথিবীকে এত রঙিন করে তোলে। আমার ওজনে আমি দিব্যি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, অথচ আমার প্রায়ই ক্লাস ফেলে দৌড়াতে হতো, কারণ স্লিম এবং বিউটিফুল হবার চেষ্টায় দিনের পর দিন না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে চলা ছাত্রীরা ফিট হয়ে পড়ত। কারও শরীর যদি অধিক ওজন ছাড়া অচল হয়ে পড়ে তবে তাকে ওজন বেঁধে দেওয়ার অধিকার কি কারও আছে নাকি থাকা উচিত? প্রতিটি মানুষের চেহারা যদি মেকআপের আস্তর দিয়ে ঢেকে একাকার করে দেওয়া হয়

তাহলে সৃষ্টির এই অবাধ বৈচিত্র্য, এই অপার সৌন্দর্য আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করব কী করে?

সুতরাং, আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই অপশক্তিকে 'না' বলি। আমি যেমন, সেভাবেই যারা আমাকে গ্রহণ করবে তাদের ভালোবাসি। অন্যদেরও ভাবতে শেখাই যেন তারা খোলসের পরিবর্তে আসল মানুষটাকে মূল্যায়ন করতে শেখেন।

বিজ্ঞাপন

অ্যাডভার্টাইজমেন্ট—ছোটবেলায় চার সিলেবলের এই শব্দটা উচ্চারণ করতে বেশ বেগ পেতে হতো। আজকাল দেখি বাচ্চারা অনেক চালাক, এত্ত লম্বা করে না বলে স্রেফ 'অ্যাড' বলে চালিয়ে দেয়। এর বাংলা 'বিজ্ঞাপন' (Big+জ্ঞাপন) শব্দটাও ওরকমই বাগাড়ম্বরপূর্ণ। এতে 'জ্ঞাপন' করার মতো সারবস্তু যা থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে 'বিগ' কথাবার্তা। প্রমাণ চাই?

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, আবুধাবিতে থাকি। টিভিতে একখানা বাসনমাজা সাবানের কেরামতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তেলচিটচিটে হাড়ির ভেতর এক ফোঁটা সাবান 'টিং' করে দিতেই সব তেল আপনিই সরে যেতে লাগল, স্পঞ্জ হাড়ির ভেতর একবার চারপাশে ঘুরিয়ে নিতেই সব তেল অদৃশ্য, পানির নীচে হাড়ি ধরতেই ঝকঝকে পরিষ্কার। বাবাকে বললাম, 'তাহলে আমরা হাড়ি ধুতে এত কষ্ট করি কেন? ঘষতে ঘষতে হাতের চামড়া উঠে যায় অথচ দাগ ওঠে না, স্পঞ্জ ক্ষয়ে যায় অথচ তেলের কিচ্ছু হয় না!' বাবা পরদিন ওই সাবান কিনে নিয়ে এলেন। আমিও বিজ্ঞাপনের মতো ডিম ভাজার ফ্রায়িং প্যানটা নিয়ে তাতে 'টিং' করে এক ফোঁটা সাবান দিলাম, কই কিছুই হলো না! বাবা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখে হাসেন; বলেন, 'তুমি কি ভেবেছ সব বিজ্ঞাপনের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে? আরও কয়েক ফোঁটা সাবান দাও।' ভ্রূ কুঁচকে বললাম, 'কিন্তু বিজ্ঞাপনে তো শুধু এক ফোঁটাই দেয়, আর সব কেমন ফকফকা হয়ে যায়!'

নাহ, কিছুই হচ্ছে না। দিলাম আরও এক ফোঁটা, তারপর আরও এক ফোঁটা, তবুও তেল সরে না। বাবা বললেন, 'স্পঞ্জ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।' বললাম, 'কিন্তু বিজ্ঞাপনে যে দেখায় তেল নিজে নিজে সরে যায়!' কিছুই মিলছে না। স্পঞ্জ দিয়ে হাল্কা করে মেজে পানির নীচে ধরলাম, দেখি তেল দাগ সব রয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'ভালো করে না ঘষলে তেল উঠবে না।' আবার সাবান দিয়ে, ভালো করে ঘষে, প্রচুর পানি দিয়ে ধোয়ার পরই কেবল তেলের কড়াই পরিষ্কার হলো। আমার মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড়; তাহলে আমাদের পুরোনো সাবানের কী দোষ ছিল? 'তাহলে তো ওরা যা দেখাল সব ভণ্ডামি, যা বলল সব মিথ্যা, আর যা করল পুরোটাই ভাঁওতাবাজি!' বাবা হাসেন, 'বিজ্ঞাপনে কি সত্যি কথা বলে নাকি?' আমার মাথায় ঢুকল না, 'সত্যি না হলে বলার দরকার কি?'

আবুধাবীতে অ্যাড দেখাত হাতেগোনা। বাংলাদেশে এসে তো দেখি অ্যাডের বন্যা; আর কী তার বাহার! অন্য নারী গায়ের ওপর ঢলে না পড়লে শেভিং ব্লেড কেনা সার্থক হয় না (নারীর সংখ্যা একাধিক হতে পারে, অথচ একাধিক বিয়ে করলেই যত সমস্যা!); অপবিত্র মুখভঙ্গি না করলে খাবার জিনিসের মজার প্রমাণ মেলে না (এই নোংরা অ্যাড বাচ্চারাও দেখছে), গায়ের রঙ ফর্সা না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না (বাহ, আর কোনো গুণের প্রয়োজন নেই, গায়ের চামড়া ঘষে একপরত তুলে ফেললেই বিয়ে সুনিশ্চিত); পাউডারের সুবাসে অন্য পুরুষকে বিমোহিত করতে না পারলে চাকরি মেলে না (তাহলে পাউডার লাগালেই হয়, লেখাপড়া করে মেধা, টাকা-পয়সা আর সময় নষ্ট করার দরকার কী?)। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ত্রিশ সেকেন্ডের একখানা অ্যাডের শেষে একখানা টুথপেস্টকে কেন্দ্র করে দাদি-নানি থেকে রাস্তার লোক পর্যন্ত সব নাচতে থাকে—সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সার্থক চিত্র! এই চিত্র বাস্তবে কখনো দেখা যায় না—এটাই দুঃখ।

বাংলাদেশে আরেক প্রকার অ্যাড দেখলাম, যেটা আরও মজার। শহীদ মিনার থেকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেকোনো জায়গায় যখন তখন লোক জমে যায় একজনের কথা শুনে। সবাই জানে লোকটা যে টোটকা ওষুধ বিক্রি করার চেষ্টা করছে তা সব ভুয়া, যে কথাগুলো বলছে সব ফাঁকা বুলি, তেমন কেউ

এই ফাঁদে পড়ে বলেও মনে হয় না। কিন্তু তার জাদুকণ্ঠের আহ্বান উপেক্ষা করে কেউ চলে যাবার সংকল্পও করে না; কেউ ভেবেও দেখে না, জীবনের কতটুকু সময় চলে যাচ্ছে বেকার কান পেতে থেকে।

একই প্রকৃতির লোকের দেখা মেলে সভা-সমিতি থেকে পথে-ঘাটে বা দাওয়াতের অনুষ্ঠানে। কোনোক্রমে একজন শ্রোতা পাওয়া গেলে বা হাতের মুঠোয় একখানা মাইক বন্দি করা গেলেই আমরা হয়ে উঠি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক একজন জ্ঞানী, গুণী, বাগ্মী ব্যক্তি। ট্রেনে, বাসে, বন্ধুর বাসায়, অফিসে একেক জনের বক্তব্য শুনে মনে হয়, 'আহা! কোথায় ছিল এই মহান ব্যক্তি আর কোথায় ছিলাম আমি?' একবার কোনোক্রমে ডায়াসের সামনে দাঁড়াতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য হয় কষ্টার্জিত তাবৎ জ্ঞান এক বক্তব্যে শ্রোতার কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়ে তাকে জোরপূর্বক শিক্ষিত করে তোলা। একবার ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠানে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। বসতে বসতে দেখি পরিচিত এক বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন; আর একটু পর পর মুহুর্মুহু তালির আওয়াজ, একেক বার তালি শুরু হলে আর থামেই না। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'ওনার বক্তব্য যতটুকু শুনলাম মনে তো হলো না এমন আহামরি কিছু, ছাত্ররা এত তালি দিচ্ছে কী বুঝে?' সাথে ছিল ফাহমিদা, দুষ্টুবুড়িটা মুখ টিপে হেসে বলে, 'আপা, আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। ওরা কি খুশি হয়ে তালি দিচ্ছে? ওরা তো তালি দিচ্ছে যাতে উনি কথা বলতে না পারেন, যেন স্টেজ থেকে নেমে গিয়ে ওদেরকে মুক্তি দেন।' তবে বক্তাও কম যান না, উনি পূর্ণ এক ঘণ্টা জ্ঞান দান করেই ক্ষান্ত দিলেন; গজর গজর করলেন আরও এক ঘণ্টা—'জ্ঞানের প্রতি বাঙালির কোনো আগ্রহ নেই।' অথচ আমি এই ব্যক্তির মুখোমুখি বসেও কোনোদিন তাঁর কথার অর্ধেকের বেশি উদ্ধার করতে পারিনি, শ্রোতাদের আর কী দোষ দেব?

বিজ্ঞাপন বলুন আর আত্মপ্রচারণা বলুন, এর উদ্দেশ্য কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির তরফদারী করা। ধরুন, এই মুহূর্তে টেলিভিশনে একখানা বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, যার চড়া মিউজিক আর কড়া রঙ কেবল আপনার বিরক্তির উদ্রেক করছে। এটাও কিন্তু বিজ্ঞাপন নির্মাতার সাফল্য; যেকোনো উপায়েই হোক তিনি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনি বাজারে গিয়ে একই পণ্যের অনেক ব্র্যান্ডের ভিড়ে টিভিতে দেখা পরিচিত ব্র্যান্ডটি দেখে একটু হলেও ঝুঁকে পড়বেন। আপনি যদি

বস্তুটি একবার কেনেন সেই একবারই বিজ্ঞাপনটি সার্থক। কার্যত অধিকাংশ মানুষ—জেনে হোক বা অজান্তে—বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়; আর তাই পাল্লা দিয়ে নির্মাতারা বানিয়ে চলেন নানান বিজ্ঞাপন। তাতে উদ্ভট উদ্ভট পরিস্থিতি দেখিয়ে তারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের বোকা বানান। আত্মপ্রচারক জনগোষ্ঠী আমাদের অলস সময়ের ফায়দা নিয়ে নিজেদের দেবদূত প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যান। আর আমরা একই জিনিস শুধু ব্র্যান্ডের নাম দেখে বেশি দামে কিনে আনি। সুতরাং, পরের বার যখন উপস্থাপক বলবেন, 'ফিরে আসছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পরই, কোথাও যাবেন না যেন,' নিজেকে তুলুন, একটি বই নিয়ে বসুন, ওই পাঁচ মিনিট বেকার টিভির দিকে তাকিয়ে না থেকে পাঁচ মিনিট জ্ঞানার্জনে ব্রতী হোন। আজ কী কী কাজ করলেন আর কী কী বাকি আছে পর্যালোচনা করুন। হতেও পারে, এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অথবা শেষ পাঁচ মিনিট। এরপর যখন কারও আত্মপ্রচারণা শুনবেন, চিন্তা করুন 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না'; যে ব্যক্তি বা বস্তু কার্যতই গুণী বা ভালো তা তো তার কাজেই প্রমাণ করবে; ঢোল পেটানোর দরকার হবে না। অতএব চলুন, আমরা আমাদের বিবেককে কাজে লাগাই, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করি, বেরিয়ে আসি 'বিগ' জ্ঞাপনের অশুভ প্রভাব থেকে; নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থকভাবে সাজাই নিজের হাতে।

“অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মার উন্নয়ন কাজ চলিতেছে”

গতকাল হাফিজ সাহেবের (পরপুরুষ না ভাই, নিজের রেজিস্টার্ড জামাই) সাথে গল্প করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বললাম, ছোট ভাই স্বপ্নচারীর ব্লগ প্রোফাইলের কথা। সে লিখেছে, “অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মার উন্নয়ন কাজ চলিতেছে”। আমার এই ভাইটি একটি সুন্দর জগতের স্বপ্ন দেখে। তাই বাস্তব জগতের পঙ্কিলতা আর মানুষের ক্ষুদ্রতা তাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। বারবার তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করি, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি মানুষের মানবতায়।

সমস্যা হলো, মাঝে মাঝে নিজেই মুষড়ে পড়ি। সংসারে সবার বড় হবার একটা বিশেষ সমস্যা আছে। আমার বাবা বলতেন, ‘সংসারের বড় সন্তানগুলো গাধা হয়।’ গাধার মতোই ভারবাহী, গাধার মতোই বোকা। সবার দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। সে নির্বিকারে খেটে যায় সবার প্রয়োজন ও আবদার পূরণ করার জন্য। নিজের প্রায় শখ-আহ্লাদ অপূর্ণই রয়ে যায় তার। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে কাউকে তেমন সন্তুষ্টও করতে পারে না। অন্যরা মনে করে, ‘আমাদের জন্য তার আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল, সে কিইবা এমন করেছে?’ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ভাই-বোনেরা বড় জনকে দেখেই তিক্ত বাস্তবতাটাকে শিখে নেয়; তাই যখন নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আর কারও দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করে না—দায়িত্ব নেওয়ার জন্য

তো বড় জন আছেনই! ব্যতিক্রম আছে, তবে সেটা নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। এসব ঘাত-প্রতিঘাতে বড় জনের মনটা একসময় কঠিন হয়ে যায়। নিজের অনুভূতিগুলোকে দমন করতে করতে একসময় সেগুলো প্রকাশ করার ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলে। মেশিনের মতো নিজের কাজ করে যায়।

ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় ছিলাম। তাই অনুভূতি নিয়ে আদিখ্যেতা জিনিসটা বাদ পড়েছে সেই ছোটবেলায়ই। এখন যে বয়সে উপনীত হয়েছি তাতে সবাই আদর করে 'আপুজি' বলে। এখন আমিও যদি ছোটদের কান্নায় সুর মেলাই; বলি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিহীনতায় আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত, শঙ্কিত, আশাহত, আহত; যদি আমি তাদের জাগিয়ে না তুলে সেই হতাশা আর ব্যথার সাগরেই ডুবিয়ে দেই...

অনেক ভাবি, আর আশ্চর্য হব না। অনুভূতির মতো বিস্মিত হবার ক্ষমতাকেও নিষ্ক্রিয় করে দেব। তবুও সে বারবার মৃতাবস্থা থেকে উঠে আসে। আমার ছেলেমেয়েকে বোঝাই, 'এই শরীরটা তো আর আমি না, আমার ভেতর যে আত্মা আছে সেটাই আসল আমি। শরীরটা যেমনই হোক, আত্মাকে উন্নত করতে হবে। তখন বলতে পারব, আমি মানুষ হবার চেষ্টা করছি। তা নইলে আমার যত বড় নামযশ হোক না কেন আমি নিজেকে মানুষ বলতে পারব না।' অথচ চারপাশে মানুষগুলোকে দেখি, কী অনায়াসে ভুলে থাকে তাদের একটা আত্মা আছে, সেই আত্মার খাবারের প্রয়োজন আছে, বেড়ে ওঠার দরকার আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে! বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মানুষ কী অনায়াসে টাকা-পয়সা, যশ-খ্যাতি, ফুর্তি আর আয়েশের পেছনে ছুটে চলেছে! কেউ ভেবে দেখছে না 'আমার কী করা উচিত,' সবাই ব্যস্ত এই ভাবনায় 'আমার কী পাওয়া উচিত'!

আমার বাসায় আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠির পয়সা বাঁচানোর জন্য কখনো চুলা নেভাই না—এটা কোনো সমস্যা না; কিন্তু দেশের বাইরে গ্যাস রপ্তানি করা হবে বলে রাস্তায় গাড়ি ভাঙচুর করি, জ্বালাই পোড়াই! ওই গাড়িটা যার, তিনি কী কষ্ট করে গাড়িখানা কিনেছেন তিনিই জানেন। আমার তো গাড়ি নেই, তাই অন্যের গাড়ি ভাঙতে আমার কী আসে যায়! যারা বাসে চলাফেরা করেন তারা জানেন বাসে কী ভীড়, কী কষ্ট। দেশের জনগণের কী সমস্যা হবে ক'টা বাস কমে গেলে তা নিয়ে কার মাথা ব্যথা? আমি

তো দেশকে ভালোবেসে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বাস পোড়াচ্ছি! অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আমরাই কেবল দেশকে ভালোবাসি। সুতরাং আমরা যা ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা করতে পারি; নইলে স্বাধীনতার আর কী অর্থ আছে?

একবার এক ছোট ভাই বলেছিল, 'আপু, আমি যখন রিক্সায় করে যাই, পাশে কোনো গাড়ি দেখলে রিক্সাওয়ালাকে বলি গাড়িতে রিক্সার চাকার ওপরের পাত ঘষে দাগ করে দিতে। আমার গাড়ি নেই, তাই অন্যের গাড়ি চড়া সহ্য করতে পারি না।' হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম! যদিও হবার কোনো অধিকার আমার ছিল না। আমাদের দেশে যে কেউ সামনে একটা টেবিল চেয়ার পেলে আর কাউকে মানুষ বলে পাত্তা দেন না। শাশুড়ি হতে পারলে নিজের বউ হবার দিনগুলো ভুলেও মনে করেন না, রাস্তায় আর কোনো রিক্সা না থাকলে রিক্সাওয়ালা দাম হাঁকেন ডাবল। আমার কি আশ্চর্য হওয়া উচিত?

এক ভাই বলছিলেন, 'আপু, মানুষের জন্য করি, করতে ভালো লাগে। কিন্তু আমার যখন কোনো সমস্যা হয় তখন আর কাউকে পাশে পাই না।' এতে কি আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত? এই না হলো মানুষ! নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়। আমি নিজেই কি মানুষ?

তবুও আশা জাগে যখন ছোট ভাই রাহাত চিঠি দেয়, 'আপু আপনি সবসময় আমাদের সাহস দেন, কিন্তু আমরা কেউ কি ভাবি আমরা আপনার জন্য কী করতে পারছি?'; যখন স্বপ্নচারী বলে, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মার উন্নয়ন কাজ চলিতেছে',—বিশ্বাস জাগে আমার ছোট ভাইবোনগুলো নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবে সেই সুন্দর পৃথিবী যেখানে মানুষ নিজের জন্য না ভেবে অন্যের জন্য ভাববে, যেখানে সবাই সবার প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করবে, থাকবে বিশ্বাস আর মায়ার বন্ধন; যেখানে মানুষ পাওয়ার চেয়ে দিতে ভালোবাসবে, যেখানে মানুষ সুন্দর একটি জীবন গড়ার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবে। কিছু 'আত্মাসম্পন্ন মানুষ' আমাদের বড় প্রয়োজন! আমরা কি পারব না সবাই মিলে আমাদের আত্মার উন্নয়ন করে আগামী প্রজন্মকে এমন একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে?

সভ্য না বর্বর?

আমার ছোটভাই আহমদ মাঝে মাঝে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলে। একবার আধুনিক শিক্ষিত লোকজনের পোশাকের অভাব নিয়ে হা হুতাশ করছিলাম। সে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আপু, দুঃখ করো না, পৃথিবীতে দুই শ্রেণির মানুষ পোশাকের অভাবে ভোগে—যারা বর্বর আর যারা নিজেদের অতিরিক্ত সভ্য ভাবে!' আমার ভাইটির বিশ্লেষণের যথার্থতা যাচাই করে অবাক হয়ে গেলাম। আসলেই তো! বর্বর জাতির লোকেরা হয়তো ঝোপজঙ্গালে বসবাস করে এদের শিক্ষা নেই, সচেতনতা নেই, তাই লজ্জাও নেই। কিন্তু শিক্ষিত মানুষ তো জ্ঞানের সাগরে মুক্তো আহরণ করার কথা, তাই না? জ্ঞানই তো হবে তাদের অলংকার! শিক্ষার মূল্য কোথায় থাকে যদি শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হারিয়ে যায়? যদি মানুষ সভ্য হয়ে আবার আদিম স্বভাবে ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত করে তাহলে তাতে কি তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে? নাকি শরীরের? তবে কি আমাদের শিক্ষাই ত্রুটিপূর্ণ?

আজ ছোট ভাই লালবৃত্তের সাথে আলাপ প্রসঙ্গো কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। লালবৃত্ত বলছিল, 'আপু, ভেবে দেখেন, সমাজে অতি দরিদ্র এবং অতি ধনবান শ্রেণির লোকেদের মাঝে আসলে খুব একটা তফাত নেই। এরা উভয়েই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে; উভয়েই অন্যের সম্পদ হস্তগত করে, খারাপ কাজে কাউকে পরোয়া করে না; উভয়েই অন্যের স্ত্রীর প্রতি হাত বাড়ায় এবং নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।' আমি জোগালাম, 'উভয়ই নিয়ম-নীতিহীন, উচ্ছৃঙ্খল।' তাহলে প্রশ্ন

আসে, মানুষের সম্পদ কী কাজে লাগে? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র যাকে পথভ্রষ্ট করে তাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু যার সব থেকেও কিছু থাকে না, তাকে কী দিয়ে সমবেদনা জানানো যায়? সম্পদ থেকে লাভ কী যদি তা তাকে একজন উন্নত মানুষে রূপান্তরিত করতে না পারে?

আমার ছাত্রী মাইমুনা দুঃখ করে লিখেছে, একজন মডেল জানে, তাকে দেখিয়ে মূলত বস্তু বিকানো হচ্ছে। এখানে সে গৌণ আর বস্তু মুখ্য। তবুও কেন মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে ব্লেড, জুতা, সাবান বা সিমেন্ট বিকানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে এমন এক অনিশ্চিত জগতে যেখানে পথ হারাবার ভয় ক্ষণে ক্ষণে? আহারে! যে মিডিয়া তাদের পণ্য বানায় সেই মিডিয়ার কল্যাণেই আজ আমাদের বোনেরা এবং তাদের বাবা-মা সবাই জানে, সেই ঝকঝকে হাসি আর তকতকে মেকআপের পেছনের জগৎটা কত পঙ্কিল। এখানে হাজার জনের মধ্যে হয়তো একজন শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সেই স্বর্ণশিখরে যার স্বপ্ন দেখে তারা এই জগতে প্রবেশ করে, ততদিনে নিঃশেষ হয়ে যায় তার অনেক অমূল্য সম্পদ। তবে কোন মোহে তারা একটি স্বল্পমেয়াদী সাফল্যের পেছনে ছোটে যার জন্য ত্যাগ করতে হয় অনেক, কিন্তু তার তুলনায় পাওয়া যায় অল্পই? মাইমুনা লিখেছে, আজ আশি বছর বয়সেও লতা মঙ্গেশকরের গান শোনার জন্য লোকে ভিড় জমায়। কিন্তু এমন একজন মডেলের নাম বলুন তো, যার আশি বছর বয়সে লোকে তাকে দেখার জন্য ভিড় করবে? পার্থক্যটা কি তা সবাই বোঝে। মেধার বিকাশ ঘটালে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা যায়। শরীরের বিকাশ মৃত্যুর আগেই সমাপ্তি ডেকে আনে। কিন্তু চোখ কান সব থাকা সত্ত্বেও মানুষ এগুলো বন্ধ করে চলতেই ভালোবাসে। এতে চিন্তা করে কাজ করার ঝামেলা থেকে সে বেঁচে যায়? কিন্তু আসলেই সে বাঁচে কি?

অনার্স জীবনে রেহানা ম্যাডাম প্রায়ই বলতেন, 'আকলমান্দকে লিয়ে ইশারাকি কাফি হ্যায়।' আমি ভাবতাম তারপরও কুর'আনে এতবার শাস্তির কথা বলার, এমনকি সূরাহ তাওবার মতো একখানা ভয়ানক থ্রেট দেওয়ার কী দরকার ছিল? একসময় বুঝলাম, এই কুর'আন কেবল জ্ঞানী মানুষের জন্য পাঠানো হয়নি, বরং সর্বজনীন পাঠকশ্রেণির জন্য একে ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে বুঝদার পাঠকদের জন্য যেমন আনন্দদায়ক এবং চিন্তা উদ্রেককারী কথাবার্তা রয়েছে, তেমনি চোর-ছ্যাঁচড়-বাটপার শ্রেণির লোকদের

জন্য রয়েছে ভয়ানক সব বিপদ সংকেত। চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। সুতরাং, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পথে আনা সম্ভব নয়। বরং জবাবদিহিতার ভয় তাকে পথে আনতে না পারলেও বিপথ হতে রক্ষা করতে পারে অনেকখানি। তাতে তার কতটুকু উপকার হলো না হলো সেটা সে বুঝবে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, নিরীহ গোবেচারা শ্রেণির লোকজন, যারা আত্মরক্ষার খাতিরেও একটা কটু কথা বলতে পারে না—তাদের কতখানি সহায়তা হয়!

বান্ধবী মিতুল আপা বলছিলেন, মানুষের নীচতায় তিনি হতবাক হয়ে যান। সান্ত্বনা দিলাম, 'আপা, হতবাক হবেন না, মানুষ নীচতায় শয়তানকেও হার মানায়। কারণ আল্লাহ তাকে শয়তানের চাইতে বেশি বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।' আসলে মানুষকে শয়তান বা ফেরেশতা কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সে পরিচালিত হয় নিজের ইচ্ছায়। বেচারা শয়তান বড়জোর তাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা পরিপূর্ণভাবে তার নিজের, কাজটাও তাকে কষ্ট করে নিজে নিজেই করতে হয়। এর জন্য সে নিজের কাছে নিজে যুক্তি খাড়া করে— কাজটা আসলে কত মহৎ, এর পেছনে উদ্দেশ্যটা আসলে কত ভালো- দস্তয়েভস্কির ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের নায়কের মতো। সে সুদখোর বুড়িকে হত্যা করার আগে নিজেকে বোঝায়- বুড়ির তো কেউ নেই, কেউ তাকে মিস করবে না, বয়স্কা মহিলা এত টাকা-পয়সা দিয়ে কী করবে? তদুপরি মহিলা একজন সুদখোর, তাকে সরিয়ে দিলে মানুষের উপকার হবে। সে একজন সম্ভাবনাময় তরুণ, তার যদি টাকা-পয়সা থাকে তাহলে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এই যুক্তির আশ্রয়ে সে বুড়িকে হত্যাও করে। কিন্তু বিবেকের দংশন তাকে শেষ পর্যন্ত ফল ভোগ করতে দেয়নি, সে নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সমস্যা হলো, কাউকে গালি দিলে তাকে সরি বলা যায়। কাউকে মেরে ফেললে তাকে কবর থেকে তুলে ক্ষমা চাওয়া যায় কি? সুতরাং, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো উপায় থাকে না।

এ তো গেল যার বিবেক আছে বা কোনো এক সুপ্রভাতে জেগে ওঠে তার কথা। কিন্তু যার বিবেকের কলকব্জায় সমস্যা আছে, তাকে কী দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলুন তো? তার জন্য আসলে নৈতিক শিক্ষা এবং জবাবদিহিতার

ভয় এ দু'টোর কোনো বিকল্প নেই। মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু তাঁকে কী করে ফাঁকি দেবে যিনি তার মনের গোপন কথাটি পর্যন্ত টের পেয়ে যান? তাঁকে কী করে এড়াবে যিনি তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখতে পান? ফেসবুকের কর্মকর্তারা আমাদের কথাবার্তা, মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দ সব পর্যবেক্ষণ করে জেনে আমরা অজানা আশঙ্কায় কুঁকড়ে যাই। অথচ কেউ এর চেয়েও বেশি জানেন তা বিশ্বাস করলে কি কোন আজেবাজে কাজের চিন্তা আমাদের স্পর্শ করতে পারত? এই একটি চিন্তাই তো আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারত সমস্ত ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা এবং কাজ থেকে—নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি।

এভাবে চিন্তা করলে আমাদের শিক্ষা আমাদের ইবনে সীনা বা জাবির বিন হাইয়ান বানাত, আমাদের বিত্ত আমাদের উসমান কিংবা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ হতে উদ্বুদ্ধ করত, আমাদের মেয়েরা খাদিজা বা আয়েশা হওয়ার স্বপ্ন দেখত, আমরা ভালো কাজ করতে পারি বা না পারি অন্যায় কাজের চিন্তাও করতাম না।

আমাদের সমাজে আজ যে অন্ধকার চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে, আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তা থেকে সহজেই উত্তরণ করা যেত জ্ঞানের আলো জ্বেলে। মায়েরা তাদের সন্তান ও সংসারের পাশাপাশি প্রয়োজন ও সময় সুযোগ হলে আর্থিক কর্মকাণ্ডেও সম্পৃক্ত হতে পারতেন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজেদের ভাসিয়ে দিতেন না অজানার পথের ভেলায়। স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন, সংসারের দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নশীল হতেন, সন্তানদের সময় দিতেন; যেন স্ত্রী কিছুটা সময় পায় নিজের উন্নয়নের জন্য। উভয়ে মিলে সন্তানদের জন্য সৃষ্টি করতে পারতেন সহযোগিতা, সহমর্মিতা আর সাহচর্যের এক অনন্য বাগান; যেখানে প্রস্ফুটিত হতে পারত তাদের পুষ্পসম সন্তান।

বাবা-মা একটা নতুন টিভি বা সাইকেল কেনার জন্য একটি মেয়েকে পাঠাতেন না বিদেশ বিভূঁইয়ে, যেখানে সে অসহায় এবং অরক্ষিত। ছেলেরা মেয়েদের বিয়ে করত না একজন ভালো স্ত্রী ব্যতীত আর কিছু পাবার আশায়। ছেলেদের বাবা-মা বিয়ে করতে বাধা দিত না ঘরে টাকা-পয়সা আসা বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে। সন্তানেরা পিতা-মাতাকে অবহেলা করে নিজেদের

সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মজে থাকতে পারত না। তারা বলত না 'আমাদের বাপ-মা তো সারাদিন পার্টি করে কাটিয়েছে, স্ফূর্তি করেছে, ওদের প্রতি আমাদের কেন দায়িত্ব পালন করতে হবে?' আমার বোনটি, আপনার মেয়েটি পথে যেকোনো একজন পুরুষকে দেখে নিজের ভাইয়ের মতোই নিরাপদ মনে করত। আমার ছেলেটি, আপনার ভাইটি মনে করত এই দেশ আমার, এই সমাজ আমার, একে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আমার। এমন একটি সমাজ কি আমরা চাই না?

পথ কিন্তু চোখের সামনেই, পা বাড়ানোর অপেক্ষা...

প্রত্যাবর্তন

কদিন আগে এক পরিচিতার মিসক্যারেজের খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলাম। কথাবার্তার এক পর্যায়ে তার এক আত্মীয়া এসে পড়লে তাদের কিছুটা আড়াল দেওয়ার জন্য উঠে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে শুনছি আগত আত্মীয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় বলছেন, 'আহা! আমি তো ভেবেছিলাম খালাম্মা আবার ফিরে আসছেন!' রোগিনী আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক আমার মনের কথাটাই বলেছ! আম্মা মারা যাবার পরপরই যখন আমি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ি, তখন এই মনে করেই সান্ত্বনা পেলাম হয়তো আম্মা ফিরে আসছেন!...'

না, তারা কেউ হিন্দু নন, আকীদাগতভাব পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হবার প্রশ্নই আসে না। এটা কেবল হিন্দি সিনেমা আর সিরিয়ালের কারিশমা। আমি ভেবেছিলাম এই আপাতদৃষ্টে সাধারণ অনুষ্ঠানগুলো কীভাবে নিজেদের অজান্তেই আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করে ফেলছে! আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে পাঠান একবারই, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এই সময়ে আমরা কী করলাম তার ওপরই আমাদের বিচার হবে। কেউ এই সুযোগ দ্বিতীয়বার পাবার সম্ভাবনা নেই। সিনেমা আর সিরিয়াল দেখে এই মূল্যবান সময় নষ্ট করার ব্যাপারটা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু হিন্দি সিনেমার প্রভাবে যদি এভাবে আমাদের এমন একটি মৌলিক আকীদার পরিবর্তন হয়ে যায় ...! এ তো সবেমাত্র শুরু, এভাবে আমাদের আরও কত আকীদা যে এই অনুষ্ঠানগুলোর কাছে বলি হয়ে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে!

আমার খুব কাছের একজনের একটি সন্তান জন্মের সাতদিন পর মারা যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর অশেষ রহমাতে তার আরও দু'টি সন্তান হয়। তিনি প্রতিদিন তার প্রথম সন্তানটির কবরের সামনে দিয়ে অফিসে আসেন। একথা শুনে একজন বলল, 'আপনি তো চাইলেই ওই রাস্তা দিয়ে না এসে অন্য রাস্তা দিয়ে আসতে পারেন।' তিনি স্মিত হেসে বললেন, 'আমার এই সন্তানটি আমার জন্য সবচেয়ে উপকারী। কিয়ামাতের দিন সে আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলে অথচ আমার মা শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, তুমি তার সকল গুনাহ মাফ করে দাও।' এর আগে আমি প্রায়ই নামাজ কাজা করতাম, 'ইবাদাতের ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না, পর্দার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। ও চলে যাবার পর থেকে আমি নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করি, রোজা এবং যাকাতের ব্যাপারে সচেতন হই, হাজ্বের জন্য টাকা জমাতে শুরু করি, আমার মেয়ে চলে যাবার পর আমি কোনোদিন মাথার কাপড় ফেলে চলিনি। তাহলে আমার যত কষ্টই হোক, আমি কি করে ওকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে পারি?...'

ওনার কথা শুনে মনে মনে পর্যালোচনা করলাম—প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী একজন মহিলা, প্রথম শাহাদাত বরণকারী একজন মহিলা, ওহুদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা.) যখন শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন তখন যে মাত্র এগারোজন ব্যক্তি তাকে ঘিরে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান তাদের একজন মহিলা, ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর মাঝে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে নয়জন রোমান সৈন্যকে একাই গেঁথে ফেলেন যিনি তিনিও একজন মহিলা, সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী দুই ব্যক্তির একজন মহিলা, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তার সমাধান দানকারীও একজন মহিলা... এই তালিকা অন্তহীন। ইসলামের বিকাশ এবং অগ্রগতিতে মহিলাদের অবস্থান সর্বত্র দৃষ্টির সম্মুখে না হলেও এর পরিচালিকা শক্তিরূপে তাদের অবদান কোনোভাবেই পেছনে নয়। একটি সমাজের প্রত্যক্ষ নির্মাতা-গোষ্ঠী পুরুষ হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ গঠনের দায়িত্ব তো আসলে নারীর হাতেই, যেহেতু একজন পুরুষকেও গড়ে তোলেন একজন নারীই। একারণেই যেকোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সে জাতির মহিলাদের পথভ্রষ্ট করাই যথেষ্ট, পতন আপনাআপনিই ঘটবে।

তাই যেকোনো জাতির পতন রোধ করতে হলে সবার আগে জানতে হবে, সচেতন হতে হবে, অতঃপর সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রথম যে হুকুম পাঠিয়েছেন তা হলো, 'পড়ো'। এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, পুরুষরা লেখাপড়া করে নারীদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে এবং নারীরা লেখাপড়া করে নিজের অবস্থান গড়ে সেই ছড়ি থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করবে। লেখাপড়া কোনো পার্থিব বস্তু বা কোনো স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়; বরং নিখাদ জ্ঞানলাভের জন্য করতে বলা হয়েছে। যে নারী নিজে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত তার হাতে কী করে নির্মিত হবে একটি আলোকিত সমাজের কর্ণধার? যে পুরুষ জ্ঞানলাভ করে অথচ সে জ্ঞান তার নিজের ছাড়া আর কারও উপকারে আসে না তার জ্ঞানের কী মূল্য? এজন্য শুধুমাত্র হৃদয়কে প্রশস্ত করার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ করা হয়েছে, নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা করা বা জীবিকার অন্বেষণের জন্য নয়।

আল্লাহ ইসলামে নারী এবং পুরুষের অবস্থান সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পুরুষ নারীর উপর দায়িত্বশীল হলেও তাদেরকে পরস্পরের জন্য পোশাক বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা একে অন্যের পরিপূরক ও সাহায্যকারী। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো ব্যাপার নেই। যে সমস্যা আমাদের নেই সে সমস্যাকে আমাদের মাঝে জন্ম দেওয়া একটি গোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত জরুরি। কেননা আমাদের মাঝে 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' সৃষ্টি করার মাধ্যমে, আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে তারা নারী-পুরুষের মাঝে এমন এক বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, যা তাদের নিজেদের সমাজকে ঠেলে নিয়েছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, যে সংঘর্ষের অনুপস্থিতির কারণে আমাদের সমাজ আজও বহমান। সেজন্য আজ পশ্চিমাদের আমাদের হিজাবি মহিলাদের জন্য দরদ উথলে ওঠে, অথচ তাদের নিজেদের সমাজে মা থেকে বোন, ভাবী থেকে শাশুড়ি, বান্ধবী থেকে সহকর্মী কোনো নারীই নিরাপদ নয়! সেজন্যই তারা চিন্তিত আমাদের 'বেচারি হিজাবি' মহিলাদের কীভাবে 'উন্নয়ন' হবে, আর নিজেরা নারীদের উন্নতির নামে নগ্ন করে পণ্য বানিয়ে ছেড়েছে!

আমাদের শক্তি, আমাদের বিশ্বাস এবং পারিবারিক সম্প্রীতি যা হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও আমাদেরকে অটল ও অবিচল রাখে। আজ হিন্দি

সিরিয়ালগুলোর টার্গেট ঠিক এই দু'টোই। সমাজের নির্মাতারাই যদি পথচ্যুত হয় তাহলে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়ে যায় অনেকখানি। আজ আমাদের মা-খালারা সিরিয়ালের জালে বন্দি। সিরিয়ালের ফাঁকে ফাঁকে নামাজটা কোনোক্রমে চলমান রাখেন। কুর'আন বা হাদীস পড়ার অথবা বাচ্চাদের সাথে এসব আলাপ করার সময় তাদের নেই। কারণ তাঁরা মূর্তির সামনে নতমস্তক বৃন্ধাদের রঙবেরঙের পোশাক আর কথাবার্তায় কুপোকাত। গৃহিণীদের সময় নেই নিজে লেখাপড়া করার বা বাচ্চাদের নিয়ে পড়তে বসার; তাই বুয়া এবং গৃহশিক্ষক রাখা হয়। শিক্ষক বাচ্চাকে আদৌ কিছু শেখাচ্ছে কি না, বা তাকে অ্যাবিউজ করছে কি না, অথবা মেয়ের সাথে প্রেম করছে কি না দেখার সময় তার নেই। কারণ তিনি শাড়ি আর গহনার ঝিলিক দিয়ে শ্বশুরবাড়ির সবাইকে বৃন্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পরকীয়াশিল্প বিস্তারের আরাধনায় ব্যস্ত।

সেদিন এক আত্মীয় বলছিলেন, 'বাংলাদেশে এখন একটা ভালো ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, কোনো বিয়েবাড়িতে গিয়ে এখন আর বোঝা সম্ভব না, এটা মুসলিম না হিন্দু বিবাহ।' কী করে বোঝা যাবে? সব তো একই পোশাক, একই সাজে সজ্জিত! রীতি-রেওয়াজগুলোর মধ্যেও আর তেমন একটা তফাত দেখা যায় না। সিরিয়ালে যা দেখা যায় সেভাবেই সবকিছু সম্পন্ন করার উদগ্র আগ্রহ সর্বত্র। আমরা কোথায় চলেছি, কেনই বা চলেছি এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও নেই। তবে এই গড্ডলিকা প্রবাহ আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় হয়তো শেষ হয়ে এসেছে। এখনো যদি আমরা মাথাব্যাথার প্রতিষেধকের প্রয়োজন বোধ না করি, পরে হয়তো মাথাটাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!

আত্মপরিচয়

১

গতকাল অফিস থেকে বেরোবার সাথে সাথে হাফিজ সাহেবের ফোন, 'আমি হয়তো চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

বুঝলাম কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। জানি, উনি অন্যের সমস্যা সমাধান করার জন্য পাহাড় কেটে সমান করে ফেলবেন, কিন্তু নিজের বেলায় যদি একটা 'উহ' শব্দ করলে জান বাঁচে সেটুকুও করবেন না। বললাম, 'সমস্যা হলে ছেড়ে দেন, রিজিকের মালিক আল্লাহ, যেখানে রিজিক থাকবে সেখানে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী অবস্থা?'

বললেন, 'সমস্যা মিটে গেছে।'

'কী হয়েছিল?'

'জেনারেল ম্যানেজার জোর করছিল হোটেলের সমস্ত পণ্য আমাদের ব্যবহার করে দেখা উচিত, যেন আমরা গেস্টদেরকে এর গুণগত মানের ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারি। যখন সে জানলো আমরা কয়েকজন মদ্যপান করি না তখন সে বলল, 'অন্তত এক সিপ খেয়ে দেখ! নইলে বুঝবে কী করে এটার গুণগত মান কেমন?' এই মহিলার অন্য দেশ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে

কোনো ধারণা নেই। কে বোঝাবে তাকে কেন আমি এই বস্তু এক সিপও পান করে দেখতে পারব না? আমি তখনই সিদ্ধান্ত নেই কিচ্ছু না বলে চাকরিটা ছেড়ে দেব। কিন্তু আমাদের হোটেলের এক শ্বেতাঙ্গিনী কর্মচারী নিকোল এগিয়ে এসে বলল, 'শোনো, আমি একজন প্র্যাক্টিসিং ক্রিশ্চান। আমার বয়স ২৪ এবং আমি এখনো কুমারী, কোনো পুরুষ আমাকে বিয়ের আগে স্পর্শ করতে পারবে না। একইভাবে মদ এবং শুকরের মাংস আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, কেউ আমাকে এগুলো পান করতে বা খেতে বাধ্য করতে পারবে না, এক সিপ কেন এক ফোঁটাও না।' এ সময় আমাদের আরেক ম্যানেজার ডেভিড এগিয়ে এলো। সে আমাকে গত চার বছর ধরে দেখছে। সে জেনারেল ম্যানেজারকে বোঝাল, 'শোন, তুমি এই ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। হাফিজ এখানে গত চার বছর ধরে কাজ করছে, সে নিজেও একজন ম্যানেজার, এখানকার সব প্রোডাক্ট সম্পর্কে ওর ভালো ধারণা রয়েছে, সুতরাং এই একটি বস্তু সে পান করে না দেখলে কোনো সমস্যা হবে না। তাছাড়া তুমি যদি এই ব্যাপারটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করো আর ওরা ধর্মীয়ভাবে নিগৃহীত হবার কারণে হোটেলের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয় তাহলে আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে যাব। আর্থিকভাবে কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা না হয় বাদই দিলাম, বদনাম হয়ে গেলে আমাদের হোটেলে আর লোকজন আসবে না।' এভাবেই জেনারেল ম্যানেজার ঠান্ডা হয়ে গেল। সে আমতা আমতা করতে শুরু করল, 'আমি তো ওদের বাধ্য করছিলাম না, কেবল বলছিলাম হোটেলের সব প্রোডাক্ট ব্যবহার করে দেখতে! ওরা না চাইলে কোনো সমস্যা নেই।'

ডেভিড ধর্মের চর্চা করে না, কিন্তু অন্যের ধর্মবোধকে শ্রদ্ধা করে। আমার বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এটাই যে, আপনি যখন কোনো ধর্ম চর্চা করার সিদ্ধান্ত নেবেন, ধর্মকে মনে-প্রাণে-শরীরে এবং জীবনে ধারণ এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন; তখন বিধর্মীদের সাথে আপনার যতটা না সমস্যা হবে তার চেয়ে বহুগুণে বেশি সমস্যা হবে আপনার কাঙ্ক্ষিত ধর্মের সেসব লোকজনের সাথে যারা ধর্ম চর্চা করে না। আপনি হয়তো কেবল আপনার নিজের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছেন, প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন যেন আপনার কাজটি ত্রুটিমুক্ত হয়, ঘাটতি কিংবা বাহুল্য দোষে দুষ্ট না হয়, আর কেউ কী করছে না করছে তার প্রতি আপনার দৃকপাত করার সময় বা

আকাঙ্ক্ষা কোনোটিই নেই; কিন্তু তবু সেই ব্যক্তি আপনার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে যে নিজে ধর্মপালন করে না কিংবা আংশিকভাবে করে। সে ভাববে যে ধর্ম পালন করার মাধ্যমে আপনি তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। আপনি তো পুরোই বোকা বনে গেলেন, 'আমি কী করলাম?'

মাঝে মাঝে মনে প্রশ্নের উদয় হয়, ওরা কি এজন্য এমন করে যে, ওরা অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করে তাদের নিজেদেরও এই কাজগুলো করা উচিত ছিল; কিন্তু দুনিয়ার লোভ, মোহ, কামনা তাদের ফিরিয়ে রেখেছে? কিংবা ভাবে আপনার নিষ্ঠা তাদের ফাঁকিবাজিটাকে প্রকাশ করে দিচ্ছে? এজন্যই হয়তো লেজকাটা শেয়াল চায় সব শেয়ালেরই লেজ কাটা যাক। তাই হয়তো আমার অন্তরঙ্গা বান্ধবী শিখা সাহা কিংবা ফ্যাং মে কিংবা ডনা জ্যাকসনের সাথে কোনোদিন কোনো সমস্যা হয়নি; অথচ মোহতারামা, খানম আর খাতুনেরা মনে করে, শুধু নামাজ পড়া আর নিজেকে আবৃত করাও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি! এজন্যই হয়তো বিধর্মীরা অন্য ধর্মকে ততটা অবমাননা করে না; যেভাবে সেই ধর্মে জন্মগ্রহণকারী অথচ পালন করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা করে থাকে। তাই যুগে যুগে জন্ম হয় সালমান রুশদী আর তসলিমা নাসরিনদের। কেন যে তারা ধর্ম পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তাদের মতো চলতে দিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো চলতে পারেন না কে জানে!

২

আমার পূর্বতন কর্মস্থলে আমি যখন নামাজের জায়গা খুঁজছি তখন পরিচয় হয় সোমালিয়ার বান্ধবী আয়শার সাথে। সে জানায় এখানে এক মিশরীয় ভাই নোমাইর মু'মিন কোম্পানীর সাথে কথা বলে একটি রুম নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে জায়নামাজ কিনে জমা করে নামাজের ব্যবস্থা করেন। আমাদের বাংলাদেশিদের অধিকাংশই হয় নামাজ পড়ে না, কিংবা বাসায় গিয়ে পড়ে অথবা নিজের ডেস্কে বসে পড়ে নেয়। তাই এই রুমে সচরাচর বাংলাদেশিদের আগমন ঘটে না। আয়শা আমাকে জানায় এই রুমে আগে কেবল পুরুষদের নামাজ হতো। এখন মহিলাদের জন্য আলাদা করে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং এর পেছনে প্রধানত যার উদ্যোগ ছিল সে হলো ফিয়োনা রোচ। নাম শুনে একটু আশ্চর্য হলাম।

বললাম, 'ওর কি সম্ভাব্য স্বার্থ থাকতে পারে যে, সে মহিলাদের নামাজের জন্য আলাদা সময় নির্ধারণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিলো?'

আয়শা বলল, 'কেন, সে নামাজ পড়ে তো!'

আমি তো হতবাক! ফিয়োনা ... রোচ ... নামাজ পড়ে! আমি তো পুরাই কনফিউজড!

ফিয়োনার নাম যেমন তেমনি ওর পোশাক-আশাক দেখেও ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে, সে মুসলিম। বুঝলাম, সম্ভবত সে নও মুসলিম এবং ইসলামের সকল ব্যাপারে তার পরিপূর্ণ ধারণা নেই। তবে সে এটুকু বুঝেছে যে, নামাজ মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। তাই অফিসে সে যেভাবেই চলুক না কেন প্রতিদিন নামাজের সময় হবার সাথে সাথে সে ওজু করে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করে নেয় এবং অফিসের কে কী ভাবল, কোন দৃষ্টিতে দেখল—কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে নিজেকে স্রষ্টার সামনে সমর্পণ করে দেয়।

আমার বর্তমান কর্মস্থলের পাশের বিল্ডিংয়েই মসজিদ। এখানে ওজু করার সুব্যবস্থার কারণে আমি অফিসে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে নামাজ পড়তে পছন্দ করি। তাছাড়া জুমার দিন এই মসজিদের খুতবাটাও দারুণ হয়। মসজিদে গেলে প্রায়ই দেখি ডাউনটাউনের বিভিন্ন এলাকা—যেখানে কাছাকাছি মসজিদ নেই কিংবা যেসব অফিসে নামাজের জায়গা নেই সেখান থেকে মহিলারা হেঁটে আসেন লাঞ্চটাইমে নামাজ পড়ার জন্য। এক ইরাকি মহিলা চার ব্লক হেঁটে আসতেন আবার হেঁটে ফিরে যেতেন প্রতি ওয়াক্তে, যেটা শীতকালে তিন ওয়াক্তও হতে পারে। ইদানিং আমি যে সময় বের হই তখন এক আফ্রিকান মহিলা আসেন যিনি কোর্টে কাজ করেন। প্রতিদিন দুপুরে যুহরের সময় পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে আসা দু'টি মানুষ একত্রিত হই একই সত্তার সামনে। এভাবেই আমাদের সকল পার্থক্য ঘুচে গিয়ে কেবল একটা পরিচয়ই অবশিষ্ট থাকে—আমরা মুসলিম। আমরা দু'জন একই সত্তাকে ভালোবাসি এবং তাঁরই জন্য পরস্পরকে ভালোবাসি এবং এতটা ভালোবাসি যে, একে অপরের জন্য যেকোনো কিছু করতে পারি, যদিও আমরা একে অপরের নামটিও জানি না!

৩

কিছুদিন আগে এক বান্ধবীর বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখি কিছু অতিথি এসেছেন যারা অপরিচিত। তাদের দেখে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলামনা সালাম দেব না আদাব বলব। তাই কোনো প্রকার সম্ভাষণের পরিবর্তে কেবল হাসি দিয়ে আগে বান্ধবীকে খুঁজে বের করলাম। তারপর কানে কানে জিজ্ঞেস করে নিলাম, 'সালাম দেব না, আদাব বলব?' সে বলল, 'দেখে বোঝার উপায় না থাকলেও ওরা মুসলিম। আপনি সালাম দিতে পারেন।'

এরা আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের সাথে নিজেদের অস্তিত্ব থেকে তাদের ধর্মীয় পরিচয়টুকু মুছে দিয়েছে। তাদের নামধাম, চেহারাসুরত, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক থেকে সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত কিছুই দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তারা মুসলিম। দাওয়াতে যাবার আগে থেকেই অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম। দাওয়াতে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সাহচর্যও তেমন স্বস্তিকর ছিল না। তাই বান্ধবী এবং আমাদের খুব কাছের এক ভাবীকে বিদায় জানিয়ে বাসায় এসে ঘুমিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করলাম।

পরে বান্ধবী ফোন করে জানালো আমাদের ভাবীসাহেবা, যিনি নিজেও আধুনিকা, এক মজার কাণ্ড করেছেন। ভাবীও এসে আমার মতোই কনফিউজড ছিলেন। তবে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন অন্যভাবে। গৃহকর্ত্রীর ব্যস্ততা দেখে তিনি তাকে বিরক্ত না করে অতিথিদের সন্তানদের সাথে খানিকক্ষণ কথা বললেন, তাদের নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তিনি গিয়ে অতিথিদের নমস্কার করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতে করতে তিনি তাদের বার বার বউদি সম্ভাষণ করতে থাকলে তারা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে থাকেন। তারা গৃহকর্ত্রীকে অনুরোধ করেন ভাবীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য। বান্ধবী নিজেও ভাবীকে এই বিষয়ে বলতে বিব্রত বোধ করতে থাকেন। তাই তিনি ইশারায় বলার চেষ্টার করেন। কিন্তু ভাবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাকে আশ্বস্ত করেন, 'না ভাবী, আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমি বাচ্চাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি যে, এরা হিন্দু। তাদের সাথে আমার ব্যবহারে আপনি কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবেন না।'

এভাবেই সমাপ্ত হয় বান্ধবীর অভূতপূর্ব দাওয়াতপর্ব!

আমার জীবনে বইমেলা

জান্নাতের চিত্র কল্পনা করার চেষ্টা করলে আমার মাথায় যে ছবিটা ভেসে ওঠে তা হলো—সারি সারি বই, হাত বাড়ালেই উড়ে চলে আসছে হাতের নাগালে, বইয়ের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে চকলেট আর আইসক্রীমের গাছ, কোনো রকম কাজকর্ম নেই, খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা নেই, দিনরাত শুধু পড়া আর পড়া! একেক বইয়ের একেক রকম রঙ, একেক রকম গন্ধ, কোনো বই পড়লে যাচাই করে নিতে পারব বিজ্ঞানীদের কল্পনা আর ডাইনোসরদের আসল চেহারা-স্বভাবে মিলামিল; কোনোটায় থাকবে আদম (আ.)-এর জান্নাত থেকে পৃথিবী যাত্রার হরর কাহিনী, কোনো বই পড়লে জানতে পারব পিরামিড আর মমি তৈরির বৈজ্ঞানিক সত্যতা, কোনোটাতে থাকবে আদ জাতির পাহাড় কেটে প্রাসাদ বানাবার থ্রিলিং কাহিনী, কোনোটাতে থাকবে সুলায়মান (আ.)-এর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীসমূহ। পৃথিবীর সব অজানা রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারব এই বই পড়ে!

এই চিত্রটার কিঞ্চিত ছায়াসদৃশ দেখতে পেতাম বইমেলায়। তাই ছোটবেলা থেকেই আমার প্রিয় জায়গা ছিল বইমেলা আর লাইব্রেরি। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটাতে বইয়ের দাম দিতে হয় আরেকটাতে লেট ফাইন, একটাতে নতুন বই আরেকটাতে পুরোনো। ছোটবেলায় যখন মায়ের হাত ধরে বইমেলায় যেতাম, মনে হতো প্রতিটি স্টলের সবগুলো বই কিনে ফেলি! সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূতের গল্প থেকে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পর্যন্ত কোনোকিছুতে আগ্রহের কমতি ছিল না। তাই বই কিনতে গিয়ে হিমসিম

খেতে হতো কোনটা কিনব আর কোনটার মায়া ত্যাগ করব। যখন আবুধাবী চলে গেলাম, যে বছর বইমেলায় দেশে আসতে পারতাম না, তখন আমার দাদার ছোট দুই ভাইবোন, ছোটদাদা আর ভালোদাদু কিনে পাঠাতেন হরেক রকম বই। এই বইয়ের মাঝে কখনো কখনো এমনভাবে হারিয়ে যেতাম যে আমার কোনো হুঁশই থাকত না। একবার মা ডাকতে ডাকতে সাড়া না পেয়ে আমার রুমে এসে আবিষ্কার করল যে, আমি আলমারি গুছানো বাদ দিয়ে একটা বইয়ের ভেতর হারিয়ে গিয়েছি। বইগুলো সব আলমারির বাইরে ছড়ানো ছিটানো আর আমি আলমারির ভেতর বসে আছি! রুমের বেহাল দশা দেখে কি যে ক্ষেপেছিলেন মা, আমার সাধের বইখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন!

আরেকবার ভালোদাদুর সাথে বইমেলায় গিয়েছিলাম। বাবা তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে টাকা নিমিষেই শেষ। অথচ কত বই তখনো চোখের সামনে আমাকে প্রলুব্ধ করছে! আমার ফুপাতো বোন পরামর্শ দিল দাদুর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে। আমি এক হাজার এক হাজার করে তিনবার ধার নেওয়ার পর আমার হুঁশ হলো কী করছি। বাসায় এসে বাবাকে বললাম। বাবা বললেন সমস্যা নেই; ওদিকে দাদু ততক্ষণে আমার আগ্রহে খুশি হয়ে ওই বইগুলো আমাকে গিফট করে দিয়েছেন! কী যে মজার ছিল সেই দিনগুলো!

তখন বাংলাদেশে শিশুতোষ সাহিত্য রচনার লোক ছিলেন এখনকার চেয়ে অনেক কম। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই প্রিয় লেখক ছিলেন আবদুল্লাহ আল মুতী। তবে আমার ছোটবেলাটা ছিল অনেকটাই উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ রায় আর রাশিয়ান সাহিত্যিকদের দখলে। ভালো লাগত টলস্টয় আর বিশ্বসাহিত্যের বড় বড় দিগ্‌গজদের লেখা। আর্কিমিডিস আর গ্যালিলিওদের ভিড়ে জগদীশ বোসের নামটা দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠত। হোমারের ওডিসির সাথে বিশ বছর সমুদ্র পাড়ি দিতাম। তাপসী রাবেয়ার সাথে রাত জেগে নিজেকে প্রবোধ দিতাম, কবরে গেলে ঘুমোবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন কেবল জ্ঞানতপস্যা। রাসূল (সা.)-এর মহানুভবতায় হারিয়ে যেতাম, গর্জে উঠতাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কিংবা গ্রিক বীরদের সাথে লড়তাম বীর বিক্রমে। আজকালকার সাহিত্যে কেন যেন সেই স্বাদ আর

পাই না, অধিকাংশ সাহিত্য এখন কেবল সাময়িক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়। সস্তা কিছু কথাবার্তা, মূল্যহীন কিছু আবেগ হয় উত্তেজনার খোরাক। কালজয়ী সাহিত্য পাওয়া যায় খুব কম। সাহিত্যে এখন মেসেজ থাকে কমই, ভাষাশৈলীর দিক থেকেও এখন সাহিত্য সর্বনিম্ন মানে নেমে গিয়েছে। এ ধ্বস কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, বরং বিশ্বব্যাপী সকল ভাষা সাহিত্যেই দেখা দিয়েছে। তবু বই পড়তে ভালোবাসি, তাই বই কিনি, তাই বইমেলাকে তীব্রভাবে মিস করি।

যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, ভর্তি হই একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। ওই স্কুলের আরব ছেলেমেয়েদের দেখতাম তারা একটি মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করত না। স্কুল বাসে যাওয়া আসার পথে ওরা ছোট্ট পকেট সাইজ কুর'আন পকেট থেকে বের করে পড়ত। টিফিন ব্রেকেও অনেকে খেলার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মাঠের একপাশে বসে কুর'আনের বিভিন্ন সূরাহ মুখস্থ করত। পদ্ধতিটা অত্যন্ত ভালো লেগে যায়, তারপর থেকে আমি যেখানেই যেতাম, সাথে বই রাখতাম যেন বসে বসে সময় কাটে না বলে হা-পিত্তেশ করার চেয়ে সময়টা ভালো কোনো কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশে ফিরে দেখলাম এতে সবাই ঠাট্টা করে 'আঁতেল', 'পন্ডিত' ইত্যাদি নামে ডাকা শুরু করল। অনার্সে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বন্ধুরা ইংরেজি চর্চা করতে গেলে সবাই হাসাহাসি করত 'জাতে উঠতে চায়'! জ্ঞানচর্চার প্রতি এই তীব্র বিতৃষ্ণায় আমি খুব অবাক হতাম। আমি এসব কানে নিতাম না বটে, তবে অনেককেই দেখেছি জাত রক্ষা করার জন্য মাঠে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় উড়িয়ে দিতে।

সেদিন এক ভাই দুঃখ করে বলছিলেন, আগের দিনের লেখকদের একটি বই একত্রে চারপাঁচ হাজার ছাপা হতো, সব বিক্রিও হয়ে যেত; আর এখন পাঁচশ' বই ছাপালেও চলে না! মজার ব্যাপার হচ্ছে, আগের তুলনায় এখন আমাদের শিক্ষিতের হার বেড়েছে বৈ কমেনি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে জাতি হিসেবে আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা কতটুকু! আবার এটাও বলা যায় যে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই বাজারে যেখানে মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেই হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে বই কিনে পয়সা 'নষ্ট' করবে কে, তাই না? তবে কথাটা মোটেই ঠিক নয়, কারণ এই বাজারেই বিক্রি হয় লক্ষ টাকা দামের

শাড়ি, হাজার হাজার টাকা দামের ইমিটেশনের গহনা, বিশাল স্ক্রীনের টিভি, গান শোনার স্টেরিও সেট থেকে লক্ষ টাকা দামের মোবাইল ফোন, কোটি টাকা দামের গাড়ি! সুতরাং একে পয়সার অভাব না বলে জ্ঞানতৃষ্ণার অভাব বলাটাই শ্রেয়! একসময় মানুষ উপহার দিত বই, কিন্তু এখন আর এত কম দামের উপহারে মানুষের মন ভরে না। একসময় মানুষ ঘর সাজাত বই দিয়ে, আজকাল এমন ঘরই বেশি যেখানে দামি শোপিস থেকে ফার্নিচার কোনোকিছুরই অভাব নেই, কিন্তু পুরো ঘরে হয়তো একখানা বইও পাওয়া যাবে না। এর পরিণতি কী তা সহজেই অনুমেয়। কাগুজে সার্টিফিকেটধারী এক বিশাল জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের কাছে বইয়ের বা জ্ঞানের তেমন কোনো মূল্য নেই। চিত্রটা কিছুতেই আমার কল্পিত জান্নাতের সাথে মেলাতে পারি না।

ভালো শাশুড়িদের গল্প

সমাজের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অনেক ভাইবোনের ধারণা জন্মেছে আমি কেবল শাশুড়িদের দোষের কথা বলি। ছোটবোন নূসরাত তো রাগ করে বলেই ফেলল, 'যদি সব শাশুড়িরা এমনই হয় তাহলে দু'আ করি আমার যেন ছেলে না হয়!' তবে যারা আমার আগের লেখাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়েছেন তারা জানেন আমি কেবল এতটুকুই আহ্বান জানাই যে, একজন নারী যেন নিজেকে কেবল শাশুড়ি না ভেবে একটি বাড়তি সন্তানের মা ভাবেন, বউকে পরের মেয়ে না ভেবে নিজের মেয়ে ভাবেন। যেহেতু পরিবারে তিনিই বড়, তিনি যেন কেবল আশা এবং ত্রুটি বিশ্লেষণ না করে উদাহরণ স্থাপন করে বউকে শেখান কী ধরনের আচরণ তিনি আশা করেন।

একটি নতুন সম্পর্কের গোড়াপত্তন কখনোই সহজ হয় না। একটি নতুন পরিবারে গিয়ে নতুন মানুষগুলোর সাথে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবেশে মানিয়ে নেয়া একটি মেয়ের জন্য যতটা কঠিন, যে সন্তানকে একজন মা তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তার উপর অন্য একজনের ব্যাপক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি মেনে নেওয়া মায়ের জন্য তার চেয়ে কোন কম কষ্টের নয়। এখানেই উদারতার প্রয়োজন হয়, নিজের নতুন বউ হয়ে আসার দিনগুলোতে ফিরে গিয়ে স্মৃতি থেকে খুঁজে নিতে হয়, তিনি কী ধরনের ব্যাপারগুলোতে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সহযোগিতা পেতেন, কিসে কষ্ট পেতেন; সে সময় তার সাথে কেমন আচরণ করা হলে সে

কষ্ট লাঘব হতে পারত এবং সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। তার ছেলের হাত ধরে তার সংসারে আসা নতুন মানুষটার সাথে মানিয়ে নিতে গিয়ে তাকে যে কষ্ট করতে হয় তা প্রশস্ত হৃদয়ের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখা চাই। কারণ তিনি নিজের বাড়িতে একজন নবাগতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন; আর মেয়েটির কাছে তো সবই নতুন; পুরাতনকে ছেড়ে আসার বেদনার দগদগে ঘা'টাও!

আজ দু'জন শাশুড়ির কথা বলব যাদের খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং ভেবেছি আমিও যেন তাদের মতোই—আমার আগত দু'টি সন্তানের জন্য যেমন—আমার অনাগত দু'টি সন্তানের জন্যেও শাশুড়ি না হয়ে মা হতে পারি। নামগুলো গোপনই থাক, ভালো মানুষগুলো লুকিয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। তাই আমরা কেবল তাদের বউদের বক্তব্য দিয়েই তাদের ব্যাপারে আলোচনা করব। বলাবাহুল্য বউদের নামগুলোও বদলে দিলাম।

যৌথ পরিবারে

বাহারের বিয়ে হয়ে যায় অনার্স প্রথম বর্ষে। বাবা বা বড় ভাই ছিল না, তাই অনাড়ম্বর বিয়ে। শাশুড়ি ওকে বাসার কাছে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সুযোগ পেয়ে বন্ধুরা প্রায়ই ক্যান্টিনের খাবার পছন্দ না হলে দল বেঁধে বাহারের বাসায় হানা দিত ভরদুপুরে। শাশুড়ি তখন ঘরে যা-ই যতটুকু থাকত তা দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করতেন। সবার সাথে গল্প করতে করতে বাহারকে পাঠিয়ে দিতেন নিজের ঘরে, মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নেওয়ার জন্য। কখনো বিরক্ত হতেন না, বউ কেন বিশ বাইশজন বন্ধু নিয়ে ভরদুপুরে ঘরে এলো। তার মেয়েরা যেমন বান্ধবীদের নিয়ে আসত, বউয়ের বান্ধবীদেরও তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতেন।

একদিন বাহারের বাসায় অনেক মেহমান। সবাইকে বিদায় দিতে দিতে রাত বারোটা বেজে গেল। শাশুড়ি দেখলেন বাহার সামান্য মন খারাপ করে ড্রয়িং রুমে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার মা, তোমার মন খারাপ কেন?' সে মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'কিছু না মা।' কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। তখন সে বলল, 'কাল শুনেছিলাম আম্মুর শরীরটা একটু খারাপ, কিন্তু আজ আর কথা বলার সুযোগ হয়নি, তাই একটু চিন্তা

লাগছিল।' শাশুড়ি সাথে সাথে ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি বের করতে বললেন। বাহারের স্বামীর সকালে অফিস আছে, তাই তাকে ঘুমোতে বলে শাশুড়ি নিজেই বাহারকে নিয়ে গেলেন ওর আম্মুর বাসায়। রাত দু'টো পর্যন্ত আম্মুর সাথে কাটিয়ে যখন ওর মন ভরল তখন তিনি বাহারকে সাথে করে নিয়ে এলেন, পরদিন ক্লাস আছে তাই।

অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষার ক'দিন আগে বাহারের প্রথম সন্তানের জন্ম হলো। কিন্তু শাশুড়ি তাকে বলে দিলেন, শুধু বাচ্চাকে মাঝে মাঝে খাওয়ানো ব্যতীত সে যেন পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো কাজে সময় নষ্ট না করে। পরবর্তীতে বাহার অনার্সের প্রত্যেক বছর এভাবেই পরীক্ষা দিয়েছে। কারণ কীভাবে কীভাবে যেন প্রতিবারই ওর সন্তানের আগমন এবং ওর পরীক্ষার তারিখ মিলে যেত। একবার পরীক্ষার সময় ওকে নোট দিতে গিয়ে দেখলাম ওর এক বাচ্চা শাশুড়ির কোলে, আরেক বাচ্চা বুয়ার কোলে, আর তিনি বুয়াকে ওর রুমের সামনে থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন—বাচ্চা শব্দ করতে পারে ভেবে। আমি বললাম, 'বাহারকে একটু ডেকে দিন, আমি নোটটা দিয়েই চলে যাব, যেহেতু আমারও পড়া আছে।' কিন্তু খালাম্মা কিছুতেই ওকে ঘুম থেকে জাগাবেন না, 'বেচারি এতক্ষণ পড়াশোনা করে একটু ঘুমিয়েছে, তুমি বরং নোটটা আমাকে দিয়ে যাও; ও উঠলে আমি দিয়ে দেব।'

একবার বাহার আর ওর জা মিলে ঠিক করল বাহারি জিনিসের দোকান করবে। ওর শাশুড়ি ওদের একটা ফ্ল্যাট খালি করে দিলেন। আবার দোকান যখন চলল না বলে বন্ধ করে দিতে হলো তখনো তিনি তাদের কিছু বললেন না। মেয়েকে আর বউদের একই দৃষ্টিতে দেখতেন বলে বৌরা যেমন তাকে ভালোবাসত, তেমনি ভালোবাসত একমাত্র ননদিনীকেও। তিনি যখন ছেলেদের মাঝে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দিলেন তখন বউদের মাঝে নিজের ফ্ল্যাটে ওঠার উদ্দীপনার চাইতেও কাড়াকাড়ি লেগে গেল—কে তাকে সাথে রাখবে। বাহার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে এমন গর্বিত হলো যেন সে পৃথিবী জয় করে ফেলেছে!

সন্তানদের লালন-পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে বাহার আর আমাদের সাথে মাস্টার্স করল না। শাশুড়ির উৎসাহে নয় বছর পর সে আমার ছাত্রী হিসেবে মাস্টার্স সম্পন্ন করে। শাশুড়ি সম্পর্কে সে বলে, 'তিনি আমার জন্য

আল্লাহর রহমতস্বরূপ, তিনিই আমার আলোর দিশারী এবং তার উৎসাহই আমার অনুপ্রেরণা, আমার সংসারের জন্য তিনি বরকতময় এবং আমার সন্তানদের জন্য তিনি ছায়াস্বরূপ।'

একক পরিবারে

সাফিনার বিয়েতে উভয় পক্ষের সকলে রাজি থাকলেও শাশুড়ি ছিলেন ঘোর বিরোধী। যখন বিয়ে হয়ে গেল, কী হবে ভেবে সাফিনা খুব ভয় পেল। কিন্তু বিয়ের পর তার কোনো আচরণে সাফিনা কোনোদিন বুঝতেই পারেনি যে, এ বিয়েতে তার মত ছিল না। ওর স্বামীর চাকরির কারণে ওদের শাশুড়ির কাছ থেকে দূরে থাকতে হতো। কিন্তু তিনি সবসময় ওর সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সুযোগ পেলেই ওর বাসায় বেড়াতে যেতেন। সাফিনা বলত, 'আমার বাসায় যত দামি জিনিস আছে সব আমার শাশুড়ির দেওয়া—কম্পিউটার, ফ্রিজ, টিভি সব।'

একদিন সাফিনা ভারী সুন্দর একজোড়া রুপার কানের দুল পরে এলো। ক'দিন পর একই কানের দুল সোনায় রূপান্তরিত হতে দেখে তো সবাই হতবাক! তখন সে খুলে বলল, 'মা ক'দিন আগে আমার কানের দুলটা দেখে নিতে চাইলেন। উনি পরবেন ভেবে আমি ওটা তাকে দিয়ে দিলাম। গতকাল উনি আমাকে ওই কানের দুল ফেরত দিলেন, সাথে একই ডিজাইনের আরেক জোড়া দুল সোনা দিয়ে তৈরি করে।'

সাফিনা একবার এক বিশেষ কাজের জন্য ওর সমস্ত সোনার জিনিস বিক্রি করে দিল। তার কিছুদিন পর এক বিয়েতে ওকে ভারী সুন্দর দু'টো চুড়ি পরে আসতে দেখে সবাই জিজ্ঞেস করল, সে চুড়ি কিনল কবে। তখন সে বলল, 'আরে এগুলো আমার না। বিয়েতে আসার আগে শাশুড়ির বাসায় গিয়েছিলাম। আমার হাত খালি দেখে মা জোর করে নিজের দু'খানা চুড়ি পরিয়ে দিয়েছেন।'

আরেকবার সাফিনা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানা থেকেই সে উঠতে পারে না। শাশুড়ি ওকে ওর বাসা থেকে নিজের বাসায় নিয়ে এলেন। ওর বাচ্চাদের গোসল করানো, খাওয়ানো থেকে ওকে রুমে খাবার এনে দেওয়া সবই উনি খুশি মনে করছেন। আমি ওকে দেখতে গেলে উনি আমাকে

নাস্তা দিয়ে বাচ্চাদের ওনার রুমে নিয়ে গেলেন, যাতে আমরা আরাম করে কথা বলতে পারি। উল্লেখ্য, উনি অত্যন্ত বড় পদে কর্মরত একজন মহিলা। সুতরাং, উনি কাজ নেই বলে বদান্যতা দেখাচ্ছেন ব্যাপারটা তেমন নয়; বরং তিনি সত্যিই ওর ব্যাপারে চিন্তিত বলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

সাফিনা বলে, 'উনি যা বলেন বা করেন তাতে কোনো বক্রতা নেই। সরাসরি কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু কাউকে মনে কষ্ট দেন না; যা ভালো মনে করেন তা করা থেকে কেউ তাকে বিরতও রাখতে পারে না, কিন্তু তিনি কারও ক্ষতি করেন না।'

একজন ভালো মনের মানুষ সবসময় প্রতিটি কথা বা কাজে যার সাথে কাজটি করছেন বা কথাটি বলছেন নিজেকে তার অবস্থানে কল্পনা করার চেষ্টা করেন, ভাবার চেষ্টা করেন তার সাথে কেমন কথাবার্তা বললে বা কেমন আচরণ করা হলে তিনি আনন্দিত হবেন, কীসে তিনি কষ্ট পাবেন এবং সেভাবেই অন্যের সাথে কথা বলার বা ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। সুতরাং, একজন ভালো মানুষ কেবল একটি ভূমিকায় নয় বরং সকল ভূমিকাতেই নিজের পূর্ণ প্রচেষ্টা দিয়ে পরিস্থিতিকে জয় করার চেষ্টা করেন।

পৃথিবীতে কেউ ত্রুটিমুক্ত নয়, উল্লিখিত দুই শাশুড়িও নন। কিন্তু তারা অপরের দোষ খুঁজে বেড়ান না, তাই অন্যরাও অনুভব করে না যে তাদের সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, ফলে তাদের আশেপাশের মানুষজন তাদের উপস্থিতিতে আরাম বোধ করেন। যেহেতু তারা সম্পর্কগুলোকে নিজেদের শতভাগ প্রচেষ্টা, মনোযোগ এবং আন্তরিকতা দিচ্ছেন, ফলে অপর পক্ষও এর চেয়ে কম দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, তারা ভাবেন না 'আমাদের কী পাওয়া উচিত', তারা ভাবেন 'আমাদের কী দেওয়া উচিত', তাই কার্যত তারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যা-ই পান তা-ই লাভ মনে করেন। সর্বাবস্থায় অন্যের মঙ্গলচিন্তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। যারা স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে এই কাজটুকু করতে পারেন তারা পৃথিবীতেও বিজয়ী হন, পরকালেও বিজয়ী হওয়ার মতো পাথেয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

IIUC ফিমেল ক্যাম্পাস

স্বভাবগতভাবে আমি খানিকটা অসামাজিক। তাই সচরাচর বিয়ে বা দাওয়াতে যেতে পছন্দ করি না। যেকোনো পাবলিক গ্যাদারিংয়ে কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা থাকে, যেটা সহ্য করতে পারি না। সেজন্যই হয়তো যাওয়ামাত্র মনে হয় আমার মহামূল্যবান সময়টা নষ্ট হলো, যেটা আর আমি কোনোদিন ফিরিয়ে আনতে পারব না। এই সময়ে আমি হয়তো একটা বই পড়তে পারতাম বা ইন্টারনেট ঘেঁটে আবিষ্কার করে ফেলতে পারতাম কোনো মহামূল্যবান তথ্য অথবা আমার ছেলেমেয়ের সাথে গল্পের ছলে তাদের শেখাতে পারতাম কিছু।

সেদিন বহুদিন পর একটা দাওয়াতে গেলাম। দাওয়াতদাতাদের খুব পছন্দ করি বলেই যাওয়া। পৌঁছেই বুঝলাম ভুল করেছি। দেবীদের সারি আর শাড়ি, রঙ আর গহনা, শাড়ি চুরি আর পরচর্চার আলাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। যতটুকু না থাকলেই নয় কোনোক্রমে ততটুকু সময় কাটিয়ে পালিয়ে এলাম। তারা অহংকারী ভাবলেন হয়তো। তবুও পারলাম না এই বেকার সময় নষ্ট করার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে। বাসায় ফিরতে ফিরতে মেঘলা দিনের আকাশ দেখে মন হারিয়ে গেল IIUC ফিমেল ক্যাম্পাসের সেই স্বপ্নময় অঙ্গানে, যেখানে অনেকজন সমমনা মহিলার সমাবেশ ঘটেছিল।

আমাদের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে ছিলেন সালমা আপা, সানজিদা, সুমাইয়া, আমি। সানজিদা অবশ্য সুমাইয়া আসার আগেই চলে যান। পরবর্তীতে

আমাদের ছাত্রীদের মধ্যে দু'তিনজন যোগ দেয়, তবে তাদের আমি খুব বেশিদিন পাইনি। বিবিএ ডিপার্টমেন্টে ছিলেন নাজনীন ও সালমা আপা। আরও ছিল সেহেলী আর তাবাসসুম, কিন্তু ওরা আমাদের অনেক ছোট। কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে ছিল আকলিমা আর আফরোজা। পরে যোগ দেয় ফারহানা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিলেন হুসনা আপা আর ফারহানা। অ্যাকাউন্টসে ফাহমিদা। পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে আসে শাকিলা। লাইব্রেরিতে ছিলেন তাওহিদা আপা। এই নিয়ে ছিল আমাদের IIUC ফিমেল ক্যাম্পাসের ছোট্ট পরিবার যা আজ কলেবরে বেড়েছে অনেক গুণ, কিন্তু শুনেছি সেই সখ্য আর নেই।

আমরা একসাথে বসলে মনে হতো ওই ছোট্ট রুমে পৃথিবীর তাবৎ তথ্য আদান-প্রদান হচ্ছে, যেকোনো এক জায়গায় বসে পড়লেই জানা যাবে অনেক কিছু। কেউ ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছে, কেউ ইকনমিক্সের জটিল তত্ত্ব নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, কেউ বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বোঝাচ্ছে অন্যদের; কেউ দেশ-বিদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে আলাপ ফেঁদে বসেছে; কোথাও আলাপ হচ্ছে বিখ্যাত চলচ্চিত্র বা গান নিয়ে; কেউ ইংরেজি ভোকাবুলারি বর্ধিত করতে ব্যস্ত, আর কেউ বাচ্চা মানুষ করার ব্যাপারে পরামর্শ করছে; কেউ হাসি-তামাশা করছে আর কেউ বা এই সুযোগে কেনাকাটা সেরে নিচ্ছে, 'বাহ, তোমার জামাটা তো ভারী সুন্দর! আবার গেলে আমার জন্য একটা নিয়ে এসো, আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি!'

আমাদের যেকোনো একজনের অসুস্থতায়, প্রমোশনে, বিয়েতে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমরা ছুটে যেতাম সদলবলে। অনেক কাছের লোকজনের অনুষ্ঠানে যাবার চেয়ে এখানে যাওয়া ছিল আমাদের জন্য অনেক প্রিয়। প্রথমত ছিল অন্তরের টান, যেটা সৃষ্টি হয়েছিল জ্ঞানপিপাসার কমন অ্যাস্পিরেশনকে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয়ত আমরা একজন আরেক জনকে যেভাবে বুঝতাম তা হয়তো আর কেউ বুঝত না। মন ছুটলে হঠাৎ করেই সদলবলে সবাই চলে যেতাম কোনো রেস্টুরেন্টে অথবা ট্যাক্সি চেপে কোনো গ্রামে-গঞ্জে আমাদের পিয়নের বিয়ে খেতে! পথে-ঘাটে, দাওয়াতে, অনুষ্ঠানে কোথাও আমাদের কথা থেমে থাকত না। কথার ক্ষেত্রের বিস্তৃতিই হয়তো

এর কারণ। আরেকটা কারণ হলো, আমরা জানতাম যাদের সাথে কথা বলছি তারাও এই বিষয়ে আগ্রহী, সুতরাং নিজেকে স্বাধীনতা দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। প্রচণ্ড গরমের দিনে কথা বলতে বলতে আমরা গরমের কথা ভুলে যেতাম, বৃষ্টির দিনে কাপড়-চোপড় ভিজে গেলেও মন থাকত চনমনে।

একবার সবাই কক্সবাজার গেলাম ট্রেনিং ক্যাম্পে, সাথে বাচ্চাকাচ্চা আর তাদের কেয়ারটেকার। সেবার ঢাকা ক্যাম্পাসের সহকর্মীরাও যোগ দিলেন আমাদের সাথে। তাদের সাথে এটাই প্রথম দেখা, কিন্তু মনে হয় যেন কত বছরের সখ্য! রাতে উঠে সবাই মিলে তাহাজ্জুদ পড়া, কেউ কেউ গরম গরম চা বানিয়ে রাতজাগা বোনদের সেবা করে সওয়াব সংগ্রহ করে নিচ্ছে। তারপর ভোর পর্যন্ত শুদ্ধভাবে কুর'আন পড়ার চেষ্টা, একেকজনের ভুল তিলাওয়াত শুনে অন্যরা সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, কিন্তু কেউ লজ্জাও পাচ্ছে না মনও খারাপ করছে না। আমাদের এই হাসির ছটার সাথে তাল মিলিয়ে হোটেলের পেছনে পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য তার সোনালি আভা ছড়িয়ে জানান দিচ্ছে রাত পেরিয়ে দিন শুরু হলো। সবাই রুমে গিয়ে বাচ্চাদের তুলে হোটেলের সামনে সমুদ্রসৈকতে ছুট। সমুদ্রের সৌন্দর্য আর মুক্ত হাওয়া পান করে ফিরে এসে আমরা শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট হয়ে বসে পড়তাম আলোচনা অনুষ্ঠানে। আপাত শান্তশিষ্ট একদঙ্গল মহিলার চোখেচোখে যে কত আলাপ হয়ে যেত তা যদি কর্তৃপক্ষ জানতেন তাহলে নির্ঘাত কপাল চাপড়াতেন! বড় হয়েও ফাঁকি মারার, দুষ্টুমি করার মজাটা যে কী দারুণ তা যারা অতিরিক্ত সিনসিয়ার তাদের কী বোঝাব?! ক্যাম্পের তৃতীয় দিন সবাই বাজারে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমাদের দু'টি করে বাচ্চা, সাথে কেয়ারটেকার, তাই সালমা আপা আর আমি যাইনি; বাচ্চাদের সময় দিচ্ছিলাম এই সুযোগে। সন্ধ্যার দিকে অন্যরা পাগলের মতো ফোন করতে শুরু করল, 'আপা, হোটেলের পেছনে আগুন লেগেছে। আমরা সামনে আছি, আপনারা তাড়াতাড়ি নেমে আসেন, আমরা অপেক্ষা করছি।' অবশ্য পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

এই ক্যাম্পের একটি সুফল হলো, আমরা চট্টগ্রাম ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেই সবাই শুদ্ধভাবে কুর'আন পড়তে শিখব। শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সদলবলে সবার কুর'আন শেখা হয়ে যায় এক মাসেই, যা এক জীবনেও উদ্যোগ নিয়ে শেখা হয়নি কারও। সাথে সাথে চালু করা হয় সাপ্তাহিক বৈঠক যেখানে

ফরমালি একজন কুর'আনের কিছু অংশের তাফসীর পড়ে শোনাতেন, আরেকজন রিসেন্টলি পড়া যেকোনো একটা বই নিয়ে আলাপ করতেন। এভাবে আমাদের অনেক কিছুই শেখা হয়ে যায়, যা হয়তো অন্যথায় সময় করে শেখা হতো না। এর বাইরে প্রতিদিনই লাঞ্চের সময় কেউ না কেউ কুর'আনের কিছু অংশ পড়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করত। লাঞ্চও শেয়ার হতো বিধায় সাধারণত এই সময় উপস্থিত থাকত শিক্ষক, অ্যাডমিন, লাইব্রেরিয়ান এবং পিয়ন সবাই। একবার আমি একটি অংশ পড়ে কুর'আন রেখে দিলাম, কাউকে কিছু বললাম না। সবাই উৎসুক হয়ে বলল, 'আপা, কী পড়লেন বললেন না তো!' অগত্যা জানালাম, 'আল্লাহ বলেছেন দুনিয়াতে আমাদের যে স্বামী বা স্ত্রী থাকবে আখিরাতেও তার সাথে থাকা যাবে।' ব্যাস, শুরু হয়ে গেল ফিরিস্তি। একজন পিয়ন এসে বলল, 'ম্যাডাম, আমার স্বামী আমার সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। গতবার রাগ করে বেতনের টাকা আমার মা'র কাছে রেখে দিয়েছিলাম। জানতে পেরে সে আমাকে চুল ধরে যে ছুঁড়ে মারল, কোথায় যে পড়লাম কতক্ষণ বেহুঁশ ছিলাম বলতে পারব না। মরার পরেও যদি তার থেকে মুক্তি না পাই।' ওর কথার মাঝখানেই আরেকজন শুরু করল, 'আপা, আমার স্বামী আমাকে তিন বাচ্চাসহ ফেলে রেখে লাপাত্তা হয়ে যায়, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, বিয়ে করেছে না কি আমি কিছুই জানিনা, আমি কি আবার ওর পাল্লায় পড়ি!' বহু কষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, এই ধরনের স্বামীগুলোকে আগে তো জান্নাতে যাবার উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে, তারপর না ওদের সাথে থাকার প্রশ্ন! তখন সবাই খুশি!!

বছরে দু'বার আমরা দলবেঁধে বাজারে যেতাম IIUC-র নবাগত ছাত্রীদের জন্য উপহার কিনতে। শ'দুই উপহার কিনতে কিনতে ফাঁকে ফাঁকে হয়ে যেত আমাদের নিজেদের কেনাকাটাও; অবশ্যই আলাদা রসিদে। তাছাড়া ছিল কারও কোনো অনুষ্ঠানে, কারও বাচ্চা হলে উপহার কেনা অথবা ব্যক্তিগত কেনাকাটা। একসাথে থাকতে থাকতে আমরা সবাই সবার রুচিপছন্দ ভালোভাবে বুঝতাম। তাই যখনই কারও কিছু কিনতে হতো সবাই দঙ্গল বেঁধে বাজারে যেতাম যাতে একেক জন একেক আইটেম দেখে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবার বাজার সেরে ফেলা যায়। সবাই সবার পরিচিত দোকানে

নিয়ে যেতাম বান্ধবীদের, যাতে অল্প দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আর দোকানদারদের তো সেদিন যেন ঈদ!

এভাবে জমে আছে আরও অনেক স্মৃতি। দু'টো সময়ের কথা খুব মনে পড়ে। যখন আমার দ্বিতীয় সন্তান হবে, IIUC ফিমেল ক্যাম্পাসের দারোয়ান থেকে শুরু করে এমন কেউ নেই যে আমার জন্য কিছু না কিছু করেনি। পিয়ন শাহীন ওর মায়ের হাতে বানানো পিঠা নিয়ে এসেছিল। আমি চট্টগ্রামের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে বরিশালে, তাই পিয়ন নাজমুন আমাকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্টাইলে শুটকি রান্না করে খাওয়ালো। অ্যাডমিন ফারহানা আর ফাহমিদা প্রতিদিন মজার মজার তরকারি করে এক্সট্রা ভাত নিয়ে আসত যাতে আমি তাদের সাথে খেতে পারি। ফারহানার আম্মা বরই আচার বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমার জন্য, কতদিন যে ভাত খেয়েছি এই আচার দিয়ে! ফাহমিদা শুধু আমাকে খাওয়ায় বলে নালিশ আসায় বেচারি একদিন ক্যাম্পাসের সবার জন্য রান্না করে নিয়ে এসে এক হুলস্থূল বাঁধিয়ে দিল! এই সময়টা আমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট ছিল বলে প্রায়ই সালমা আপার সামনে পা তুলে বসে থাকতাম, কিন্তু উনি কখনো মাইন্ড করেননি। বরং আমি অ্যাডমিশন টেস্টের খাতা কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বেচারি আমার ভাগের খাতাও কিছু কেটে দিতেন। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত কাজ করেছে সুমাইয়া আপা। জোরপূর্বক বাস থেকে, ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে হলেও রিহামের জন্ম পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন উনি আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়েছেন, আবার চিন্তা করব দেখে রাদিয়াকে স্কুল থেকে তুলে সাথে নিয়ে নিয়েছেন। ডাক্তারের কাছে আনা-নেওয়া করেছেন যেন আমি একা না যাই। প্রায়ই বাইরে কিছু না কিছু খেতে নিয়ে যেতেন। আমরা দু'জনেই বাইরে বড় হওয়ায় আমাদের খাবারের রুচিপছন্দ প্রায় একই রকম যা অন্যরা হয়তো মুখেও দেওয়ার উপযুক্ত মনে করবে না। আমার যত প্রয়োজনীয় কেনাকাটা উনি সাথে নিয়ে করে বাসায় পৌঁছে দিতেন- মাসের পর মাস! এই ঋণ কী দিয়ে শোধ করা সম্ভব?

ক্যানাডায় চলে আসা যখন সাব্যস্ত হয় তখন ফিমেল ক্যাম্পাস থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয় চারবার! প্রতিবার ভাবি, এবার হয়তো ওরা আর আমার চেহারা দেখতে চায় না; আবার হুসনা আপার টেলিফোন, 'আপা,

চলে আসেন!' সবচেয়ে স্মরণীয় ছিল যেবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। আট বছরে আমি যাদের পড়িয়েছি, অনার্স থেকে মাস্টার্স, ইংরেজি থেকে এমবিএ, সকল ব্যাচের যাকে যেভাবে খবর দেওয়া গেছে সবাই এসেছে। প্রত্যেক ছাত্রীর সাথে আমার কত স্মৃতি! এদের কারও সাথে স্টাডি ট্যুরে গিয়েছি সিলেট বা অন্যত্র; কাউকে ফুলটাইম বা কাউকে কেবল এক সেমেস্টার পড়িয়েছি, এমন ছাত্রীও এসেছিল যাকে কখনো পড়াইনি; কাউকে হয়তো কখনো বকা দিয়েছি, কাউকে পরামর্শ দিয়েছি, কাউকে সাহায্য করেছি, কাউকে দিয়েছি সান্ত্বনা; কারও কাছে শিখেছি অনেক কিছু, আর কাউকে হয়তো দিতে পারিনি কিছুই।

অনেকের কাছেই RBA নামটা ছিল ভয় পাওয়ার মতো। আমার সহকর্মীরা আমার নামের অক্ষরগুলোকে উলটে RAB বলে ভয় দেখাতেন ছাত্রীদের। কিন্তু আমি চলে যাব বলে সেই ছাত্রীদের কারও কান্না আর কারও প্রচণ্ড রাগ দেখে মনে হলো কিছু হয়তো করতে পেরেছি। অনেকেই উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। সবই আমার প্রিয়। কিন্তু দু'টো উপহার মনে গেঁথে গেছে। একটি সেমেস্টারের ছাত্রীরা একটা অটোগ্রাফবুক উপহার দিয়েছিল ওদের সবার মনের কথা লিখে। প্রতিটি পাতায় যেন ভালোবাসা উপচে পড়ছে। আরেক ছাত্রী হঠাৎ ওর ওড়না থেকে ব্রোচটা খুলে আমার ওড়নায় পিন করে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'এটা ওখানেই ভালো মানাচ্ছে!'

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সালমা আপা। ছাত্রী শিক্ষক এবং অ্যাডমিন সহকর্মীদের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বলতে থাকেন আমাদের একসাথে আট বছর কাটানোর নানান রংবেরংয়ের কাহিনী। চোখ বুলিয়ে দেখি শিক্ষকদের মাঝেও আমার অনেক ছাত্রী যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যোগদান করেছে। ওদের ভালোবাসাস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি দেখে মনে হলো এক জীবনে এতগুলো উদার মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া, ভালোবাসা পাওয়া কয়জনের ভাগ্যে জোটে?

‘আমি’ময় পৃথিবী

দরখাস্তটা রিভিশন দিতে গিয়ে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ছোট ছোট তিনটা প্যারার এইটুকু অ্যাপ্লিকেশনটাতে ‘আমি’ শব্দটা এসেছে সাতবার, ‘আপনি’ শব্দটি নেই একবারও। কী আশ্চর্য! আমি একজনের কাছে কিছু চাইছি, সুতরাং চিঠিটাতে তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত; অথচ এর সর্বত্র ‘আমি’র ছড়াছড়ি! আবার অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে বসলাম। বেশ কিছু সময় নিয়ে, অনেক অনেক কাটাকুটি আর ভাষার সতর্ক ব্যবচ্ছেদের পরও তিনটা ‘আমি’ রয়েই গেলো, যেগুলো কিছুতেই বাদ দেওয়া গেল না। ঘটনাটায় নিউরনে একটা আলোড়ন খেলে গেল, চরম লজ্জা পেলেও নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, মানুষ আসলেই বড় আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর প্রাণী!

কথাটা শুনতে খারাপ শোনালেও আমাদের প্রাত্যহিক বাক্যালাপের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, আসলে তত্ত্বটা কতটা সত্য। আমাদের প্রতিদিনকার সংলাপগুলো একত্রিত করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশ বাক্যই শুরু হয় ‘আমি’ বা ‘আমার’ শব্দটি দিয়ে। আমাদের সংলাপে ‘আমি’র সাথে সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত ‘তুমি’ বা ‘সে’র অভাব প্রকট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো আসে ‘তুমি’ বা ‘সে’ কে নিয়ে ‘আমি’র সমস্যা কিংবা অসন্তুষ্টি কিংবা নালিশ ব্যক্ত করতে। সংলাপের এই সংকীর্ণতা প্রতিফলিত হয় আমাদের আচরণিক জীবনেও। এই ‘আমি’ময় পৃথিবীতে ‘তুমি’ বা ‘সে’র প্রতি মমতার অনুপস্থিতি আসলেই আতঙ্কজনক! ‘আমি’র চাওয়া-পাওয়া

নিবৃত করার জন্য 'তুমি' বা 'সে'র প্রতি নির্দয় হওয়া কিংবা তাকে মিটিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

যখন আমরা 'তুমি' বা 'সে'কে আদৌ মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত থাকি তখন বলি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এই কথাটাতেও আত্মঅহমিকাই প্রকাশিত হয়, কেননা এখানে 'আমি'র অনুভূতিটাই মুখ্য, 'তুমি' বা 'সে'র অনুভূতিটা গৌণ; বরং ব্যাপারটা এমন যে, আমি যে তাকে ভালোবাসি তাতেই তার আনন্দিত, বিগলিত, মুগ্ধ এবং কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত। কী অদ্ভুত, তাই না? যাকে মূল্যায়ন করার জন্য এই ভালোবাসা তার চেয়েও এখানে আমার অনুভূতি, আমার চাহিদা, আমার অহমিকাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ! তাই তো আমরা অহরহ দেখি, কেউ ভালোবাসায় সাড়া না দিলে তাকে অ্যাসিডদগ্ধ করতে কিংবা হত্যা করতেও মানুষ পিছপা হয় না। একে কি আসলে ভালোবাসা বলা যায়? ভালোবাসা তো সেটাই যেখানে অন্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ আমার কাছে নিজের চাহিদার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে, নইলে 'তুমি' বা 'সে'র আর কী মূল্য থাকে?

পৃথিবীতে যত সমস্যা তার শুরু এই 'আমি' দিয়ে। আমাদের সারাক্ষণ ভাবনা আমি কী চাই, আমার কী পাওয়া উচিত, আমি কী পেলাম, আমার যা চাওয়া ছিল তা কেন পেলাম না। এই যাত্রাপথে আমাদের কখনো মাথায় আসেনা 'তুমি' কিংবা 'সে' কী চায়, 'তুমি' বা 'সে'র কী পাওয়া উচিত, 'আমি' কি 'তুমি' বা 'সে'কে বঞ্চিত করছি কি না। ব্যস্ত জীবনের অঙ্গন থেকে কিছু সময় করে নিয়ে কারও সাথে দেখা করতে গেলাম, সে প্রথমেই বলবে, 'তুমি কি আর আমার খবর রাখো?' একবারও ভাববে না, আমিই তো তার সাথে দেখা করতে গেলাম! কিংবা এতদিন আমি কেমন ছিলাম, বা কেন তার সাথে দেখা করতে পারিনি, বা সে তো একদিনও আমার কোনো খবর নেয়নি! এখানেও সমস্যা 'আমি'কে এতটা মুখ্য মনে করা যা 'তুমি' বা 'সে'র সুবিধা-অসুবিধা সমস্যা এমনকি তার উপস্থিতিকেও আমলেই নেয় না!

দুনিয়ার যত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু এই 'আমি'টা। 'তুমি কী করে আমার জন্মদিন ভুলে গেলে?' 'তোমার সাথে বিয়ে হয়ে আমি কী পেলাম?' 'আমার কথা আর কে ভাবে?' 'আমি নিজ কানে শুনেছি এই কথা,'

'আমার ধারণা ব্যাপারটা এমন,' 'ওর একদিন কি আমার একদিন,' 'আমি কম যাই কিসে?' এই 'আমি'কেন্দ্রিকতার কোনো শেষ নেই। এই আমিত্ব আমাদের অনুদার, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অনাস্থাশীল, অহংকারী, প্রতিশোধপ্রবণ এবং বোকার স্বর্গে বসবাসকারী করে তোলে। এই 'আমি'কে আমরা কতটা অপরিহার্য মনে করি তা আমাদের প্রচলিত বাগধারাতেও প্রকাশ পায়।

আমরা কথায় কথায় বলি, 'চাচা, আপন পরান বাঁচা।' বস্তুত কথাটার পেছনে স্বার্থপরতার গন্ধটা যে কত উৎকট তা কি আমাদের একটুও নাড়া দেয় না? সবাই যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস কতটা কলঙ্কময় হতো তা কি আমাদের চিন্তায় আসে কখনো? সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কি পৃথিবীতে কোনোদিন কোনো মহিমান্বিত আত্মত্যাগের ইতিহাস রচিত হতো? যুদ্ধ কিংবা মহামারীর সময় সেবা করার কোনো লোক পাওয়া যেত? কেউ মৃত্যুর পারে দাঁড়িয়ে অন্যকে পানি পান করার অগ্রাধিকার দিত? জাহাজডুবির মুহূর্তে কেউ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লাইফবোটে তুলে দিয়ে ডুবন্ত জাহাজে রয়ে যেত? একজন মহামানবকে বাঁচাতে এগারো জন মহাত্মা নিজেদের শরীরকে ঢালে রূপান্তরিত করত? একজন মা কি তার শরীর দিয়ে ঢেকে দিত তার সন্তানকে যেন ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়া দেওয়াল তাকে থেঁতলে দিলেও সন্তান অক্ষত থাকে?

প্রতিদিন এই পৃথিবীটাকে দেখি, এই পৃথিবীর মানুষগুলোকে দেখি, যাদের দিন শুরু হয় 'আমি' দিয়ে, দিন শেষ হয় 'আমি' দিয়ে। এই 'আমি'র বাড়ি লাগে, গাড়ি লাগে, খাবার লাগে, পোশাক লাগে, চিকিৎসা লাগে, সম্মান লাগে, ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য লাগে, সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে আরও লাগে; তবু তার 'তুমি বা 'সে'র ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো নিয়েও ভাবার সময় হয় না, তাদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা তাকে নাড়া দেয় না। প্রতিটি 'আমি' অমর হতে চায় যেন একজন 'আমি' পৃথিবী থেকে চলে গেলে মানবজাতির বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে, অথচ কত কোটি কোটি 'আমি' পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যাদের কেউ মনেই রাখেনি! প্রতিটি 'আমি' নিজেকেই সেরা মনে করে, যেন পৃথিবীতে কোনোদিন কোনো শ্রেয়তর মানবের পদচিহ্ন পড়েনি, অথচ এই পৃথিবীর ইতিহাসে হাজার হাজার উজ্জ্বল

নক্ষত্র স্বমহিমায় জাজ্বল্যমান! প্রতিটি 'আমি'র প্রয়োজনগুলো পূরণ করেন একজন 'আমি'; অথচ সেই 'আমি'কে কেউ ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরে থাক, স্বীকার করা পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করে না!

এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে কিছু বিচিত্র মানুষ জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন 'তুমি' কিংবা 'সে'কে নিয়ে ভাবার, তাদের স্বপ্ন পূরণ করার, নিজের প্রয়োজনগুলোকে সীমিত করে অপরের প্রয়োজনগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার। সবাই তাঁদের বোকা বলে। কিন্তু, এই 'আমি'ময় পৃথিবীর স্বার্থের ঈষদচ্ছ আচ্ছাদনের ভেতরে যেসব জঘন্য কীর্তিকলাপ চলে তার কিঞ্চিৎ দেখেই আমার কেবল ইচ্ছে হয় এই বোকাদের দলে যোগ দিতে। সূর্যের প্রচণ্ড টান উপেক্ষা করেও কিছু কিছু উল্কা ছিটকে চলে আসে এই মাটির পৃথিবীতে, এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে ওঠে সেই মহাকাশচারী। একটি জীবনের জন্য একবার জ্বলে ওঠাই কি যথেষ্ট নয়? হাজার হাজার বছর ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকার চেয়ে ওই এক মুহূর্তের জ্বলে ওঠাই কেন যেন কিছু কিছু মানুষকে বেশি আকর্ষণ করে। কেননা ওই একটি মুহূর্তে সে স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে আসতে পারে, আমিত্বের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে, অন্যের আকাশটাকে আলোক মালায় সাজিয়ে দিতে পারে, অপরের মধ্য দিয়েই তৈরি করতে পারে নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় – এখানেও 'আমি'টাই উজ্জ্বল, কিন্তু সংকীর্ণ নয়। এই 'আমি'টাই হতে ইচ্ছে করে খুব। জানিনা পারব কি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই!

একটি উত্তম বৃক্ষ

ছাত্রজীবনে ভালো তার্কিক ছিলাম। চ্যাম্পিয়ন হয়েছি কয়েকবারই। তবে বাস্তব জীবনে আমি একজন উত্তম শ্রোতা। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মৌন থাকতেই ভালোবাসি। ঝগড়ার অভ্যাস নেই, যারা বকতে চায় তাদের ইচ্ছেমতো বকতে দেই, উত্তর না পেয়ে একসময় তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যায়। শুধুমাত্র ভদ্রতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া ব্যতীত কথা বলে সময় নষ্ট করার চেয়ে কিছু পড়া বা কোনো গঠনমূলক কাজ করায় সময় দেওয়াটাই শ্রেয় মনে হয়।

সেই নবম শ্রেণিতে কঠোর সংকল্প করেছিলাম কথা বলা কমিয়ে দেব। দীর্ঘ সময় সাধনা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এই পর্যায়ে এসে হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া সবার সাথেই আমি খুব ভেবেচিন্তে, মেপেঝুঁকে, যুক্তি দিয়ে কথা বলি। তারপরও যারা তর্ক করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে ইমাম গাজালির পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করি। তাঁর শব্দগুলো হুবহু মনে নেই তবে কথাগুলো ছিল মোটামুটি এরকম:

‘কেউ যদি আমাকে জানার জন্য প্রশ্ন করে তবে আমি তার সাধ্যমত উত্তর দেই; তর্ক করার উদ্দেশ্যে কেউ কিছু বললে আমি তাকে বলি ‘সালাম’ এবং তার কথার কোনো উত্তর দিই না; কোনো পাগল যদি আমাকে কোনো প্রশ্ন করে আমি উত্তর দিই না যেহেতু তার বোঝার ক্ষমতা নেই; কোনো মূর্খ ব্যক্তি আমাকে কোনো প্রশ্ন করলে আমি তাকেও কোনো

জবাব দিই না কারণ ঈসা (আ.) অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন কিন্তু কোনো মূর্খকে জ্ঞানী বানাতে পারেননি।'

খুব অবাক হই যখন দেখি মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করে সময়, মেধা এবং শ্রম নষ্ট করে। কাউকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে নিজের মুখ এবং অন্যের চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করে। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঠিক এবং অপরের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেও পিছপা হয় না। আমার এক অতি জ্ঞানী মামা একবার আমার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ের আনন্দে পানি ঢেলে দিয়েছিলেন এই বলে, 'বিতর্ক একটা বাজে জিনিস। তুমিই বলো, বিতর্কে কে জেতে? যে সত্য বলল সে, না যে যুক্তিতর্ক দিয়ে মিথ্যাটাকেও সত্য প্রমাণ করতে পারল সে?' সেদিন থেকেই বিতর্ক বাদ দিলাম। উকিল হবার শখ ছিল Paper Chase আর L.A. Law তে তুখোড় সব উকিলদের অকাট্য সব যুক্তি দেওয়া দেখে সেই ইচ্ছাও বাদ দিলাম। জীবনে একটি কাজ করতে কখনো পিছিয়ে যাইনি তা সে যতই কঠিন হোক না কেন, তা হলো সত্যকে গ্রহণ করা। মতের অমিল সত্ত্বেও অন্যের ভালোটুকু গ্রহণ করতে পারলে লাভ আমারই, আর ভালো সবার মাঝেই আছে, এমনকি শয়তানের মাঝেও শিক্ষণীয় অনেক গুণ আছে। তার অধ্যবসায় অতুলনীয়, সে কখনোই হাল ছেড়ে দেয় না।

একবার আই.আই.ইউ.সি অফিসে বসে আছি, একটা ফোন এল, রং নাম্বার, কিন্তু লোকটা ইংরেজিতে কতোগুলো অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করে নিজের পরিচয় উপস্থাপন করল, তারপর লাইন কেটে দিল। ফাহমিদা শুনে বলল, 'আপনি ইংরেজির মাস্টার, সে দু'টো কথা শোনালে আপনি তাকে পনেরো মিনিট লেকচার শোনাতে পারতেন। অথচ আপনি কিছুই বললেন না! ' বেচারি আমাকে বড় ভালোবাসে তাই এটুকুও ওর সহ্য হলো না। কিন্তু আমি তাকে বোঝালাম, 'বললে কী হতো বলো? আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হতো, ব্যাপারটা নিয়ে একটু অহংকারের প্রকাশ ঘটত, ওর দু'টো গুনাহর বদলে আমি পনেরোটা গুনাহ সঞ্চয় করতাম, এই তো? কিন্তু আমি ওর সাথে পনেরো মিনিট নষ্ট করার পরিবর্তে দশ মিনিটে কুরআনের

দু'টো পৃষ্ঠার অনুবাদ পড়লাম, তারপর পাঁচ মিনিটে তোমাকে এর সারাংশ শোনালাম। কোনটাতে লাভ বেশি হলো বলো দেখি?'

ফাহমিদা একা নয়, চুপ করে থাকি বলে অনেকেই আমাকে বোকা ভাবে, 'এ কেমন প্রাণী, চোখের সামনে লোকে বলে যায় অথচ সে একটা টু শব্দ করে না?' কিন্তু দেখুন আল্লাহ কী বলছেন, 'রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, 'সালাম' (সূরাহ আল-ফুরক়ান, ২৫:৬৩)। একজন বিশ্বাসীর মাঝে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলির একটি হলো, তারা 'অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত' (সূরাহ আল-মু'মিনূন, ২৩:৩) এবং 'যখন তারা কোনো বাজে কাজ কিংবা অসার কথাবার্তার নিকটবর্তী হয় তখন তারা এতে যোগ না দিয়ে সম্মানের সাথে চলে যায়' (সূরাহ আল-ফুরক়ান, ২৫:৭২)।

'পরম করুণাময় আল্লাহ, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' (সূরাহ আর-রহ়মান, ৫৫:১-৪)। সুতরাং, ভাষা মহান স্রষ্টার এক অনন্য নিয়ামত; এর উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে উত্তম ফল লাভ করা। যে কথার উদ্দেশ্য বিধেয় ঠিক নেই সে কথা থেকে কোনো ফল আশা করা যায় না। এমনকি আল্লাহ বলছেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে, অতঃপর তাকে পৌঁছে দিয়েছি নিকৃষ্টতম পর্যায়ে' (সূরাহ আত়-ত়ীন, ৯৫:৪-৫)। সেই পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য কথাও একটি মাধ্যম বটে!

ফলের কথায় জান্নাতের প্রসঙ্গ মনে এল। এর বর্ণনায় বিবিধ প্রকার খাবার, পোশাক, বাড়িঘর এবং সম্পদের চাকচিক্যের কথা এসেছে। স্বভাবজাতভাবে আমি অত্যন্ত নীরস প্রকৃতির, খাবার-দাবার এবং চাকচিক্যের প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবরই একটু কম। তাছাড়া নিজের কর্মকাণ্ডে আমি জাহান্নামে না যাওয়া নিয়ে এতটা চিন্তিত যে জান্নাত নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ বিশেষ একটা হয়ে ওঠে না। তাই জান্নাতের বর্ণনাসম্বলিত আয়াতগুলো পড়ে যতটা না উজ্জীবিত হই তার চেয়েও বেশি চিন্তিত হই যে, এখানে আমি কীভাবে প্রবেশাধিকার অর্জন করব! তবে আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি সূরাহ হলো সূরাহ গাশিয়াহ, এই সূরার দু'টো আয়াত আমাকে জান্নাতে যাবার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আমি অত্যন্ত আরামপ্রিয়। তাই যতবারই পড়ি,

'সেখানে সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে।' (সূরাহ আল-গাশিয়াহ, ৮৮:১৫), নিজের অজান্তেই ঠোঁটের কোণে আনন্দের হাসি খেলে যায়, সত্যিই প্রলুব্ধ হই। অপর যে বিষয়টি আমাকে স্বর্গীয় উদ্যানসমূহের প্রতি আকৃষ্ট করে তা হলো, 'সেখানে তারা কোনো অসার কথাবার্তা শুনবে না' (সূরাহ আল-গাশিয়াহ, ৮৮:১১)।

চুপ করে থাকি তার অর্থ তো আর এই নয় যে, মানুষের কথায় কষ্ট পাই না! সৃষ্টিকর্তা যে মুখখানা দিয়েছেন অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দিতে, দু'টো মায়াভরা কথা বলে সমবেদনা জানাতে, একটু বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শের মাধ্যমে অন্যের সমস্যার সমাধান দিতে, সে মুখখানা দিয়ে মানুষ কী ভয়ানক সব অস্ত্র ছুঁড়ে মারে, কী অশ্লীল সব শব্দাবলি উচ্চারণ করে, কী নির্লিপ্তভাবে অন্যের হৃদয়ে মারিয়ানার গহ্বর সৃষ্টি করে দিয়ে অহংবোধ করে! হৃদয় তো ভারাক্রান্ত হবেই। তখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় সেই উদ্যানে যেখানে 'তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম' (সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:২৩)। কতই-না সুন্দর সে সম্ভাষণ! অথচ মানুষ বোঝে না, আজ যারা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অন্যের মনে কষ্ট দিচ্ছে তাদের নিক্ষেপ করা হবে এমন এক প্রজ্জ্বলিত আগুনে, 'যা তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে' (সূরাহ আল-হুমাযাহ, ১০৪:৭), শুধু শরীর দাহ করে ক্ষান্ত হবে না।

আল্লাহ বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন' (সূরাহ তাওবাহ, ৯:৭১)। রাসূল (সা.), যিনি ছিলেন কুর'আনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি—তাঁকে আমরা দেখি তিনি ছিলেন মিতবাক; তিনি হাসিমুখে কথা বলতেন, অতিরিক্ত জোরেও কথা বলতেন না, আবার অতিরিক্ত নিচু স্বরেও নয়, প্রয়োজনীয় কথা তিনবার বলতেন। রেগে গেলেও কথাবার্তায় মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন না, মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করতেন, অন্যায়কারীর প্রতি ছিলেন ক্ষমাশীল, উপদেশ দানে অগ্রগামী। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে সকল পরিস্থিতিতে ভালো কথা বলতে হয়, ভালো আচরণ করতে হয়। কিন্তু আমরা, তাঁর অনুসারীরা, তাঁকে কতটুকু অনুসরণ করি?

রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি আমরা জানতে পারি আগামীকাল কিয়ামত হবে তবুও যেন আমরা ভালো কাজ করা বন্ধ না করি, এমনকি যদি তা হয় একটি চারাগাছ লাগানো—আগামীকালের কিয়ামাতে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু আমার উত্তম নিয়্যাতটি আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকবে। হয়তো এই চারাগাছটিই আমাকে বাঁচাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে! তাই প্রতিদিন এখানে সেখানে ছোট ছোট চারাগাছ লাগাই—ট্রেনে দশ মিনিটের জন্য পরিচয় হওয়া মেয়েটির মনে, অফিসের লিফটে এক মিনিটের সাহচর্য পাওয়া মহিলাটির মানসে, খাবার দোকানের দোকানিটির মাথায়, বন্ধুদের আসরে, পথিকের হৃদয়ে। হয়তো একদিন এই চারাগাছগুলো ডালপালা মেলে দাঁড়াবে, হয়তো একদিন এদের শাখা-প্রশাখায় পাখিরা আশ্রয় খুঁজে নেবে, হয়তো একদিন এর বীজগুলো ছড়িয়ে পড়বে আরও হাজারো হৃদয়ে। হয়তো কিছুই জন্মাবে না এগুলো থেকে, মুকুলেই ঝরে যাবে সব। কিন্তু আমার প্রতিপালক তো আমার প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, 'যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম!' সেদিনের আশায় চলুন আমরা সবাই উত্তম বৃক্ষসমূহের চারাগাছ বুনি। হয়তো আমারটি প্রস্ফুটিত হবে না, হয়তো আপনারটি হবে। তখন না হয় উত্তম পরামর্শের বাহানায় সেখানে আমিও কিছু ভাগ বসাব!

বুদ্ধিমান বোকা

বছর কয়েক আগের কথা। কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে আমার ননদিনী আইরিনের বক্তব্য জিজ্ঞেস করলে আরেক ননদ রিমি হাসতে হাসতে বলে, 'আইরিন আপার মতামত মানে তো জানেন, ওর চোখে সবাই অসাধারণ।' এই কথা নিয়ে আমরা সবাই হাসলাম কতক্ষণ। গতকাল দেখি আমার ছোট ভাই আমার মেয়েকে বোঝাচ্ছে, 'আমার বোনের চোখে ফুলচন্দন পড়ুক(১), সে কোনো কিছুর মধ্যেই খারাপ কিছু খুঁজে পায় না, পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জিনিসের মধ্যেও সে ভালো কিছু খুঁজে বের করে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে।' বুঝলাম, আমার ভাইটি আমার বারো বছরের ছোট হলেও ওর ধারণা পার্থিব জ্ঞানের দিক থেকে ওর বোন ওর চেয়ে অবুঝ। তলিয়ে দেখলাম কথাটা কতটুকু সত্য। ভাবতে ভাবতে যা বুঝলাম তা হলো, এটি আংশিক সত্য। আমি যখন অনার্সে পড়ি তখনো যদি কেউ বলত, 'আমার দাদা তার নব্বই বছর বয়সে এক ওয়াক্তের নামাজও কাজা করেননি' কিংবা 'আমার নানি জীবনে কোনোদিন কোনো গুনাহ করেননি'; আমি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতাম, মুগ্ধ হয়ে যেতাম, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গকে উর্ধ্বাকাশের বাসিন্দাদের মতোই নিষ্পাপ গণ্য করতাম। তবে আজ কেউ এমন কথা বললে আমি তা বিশ্বাস করব না।

---

(১) সে ফুলচন্দন শব্দটিই বলেছিল বিধায় আমি তা হুবহু তুলে ধরলাম। কিন্তু কল্যাণকামনার ক্ষেত্রে এটা পৌত্তলিকদের ব্যবহৃত শব্দ, যার পেছনে হয়তো তাদের ধর্মীয় কোনো বিশ্বাস থাকতে পারে। কারণ ফুলচন্দন তাদের পূজার একটি উপকরণ।

কারণ? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন রাসূল (সা.)। তাঁর ব্যাপারে তাঁর প্রভুর বক্তব্য হলো, 'তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়' (সূরাহ তাওবাহ, ৯:১২৮)। তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, নিঃসন্দেহে অসাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমাদের যেসব আনন্দ-বেদনা, সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা রয়েছে তা তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না বলেই তিনি মু'মিনদের মাঝে যারা দুর্বল তাদের হেয় করার পরিবর্তে তাদের প্রতি ছিলেন স্নেহশীল, দয়াময়। খন্দকের যুদ্ধের সময় তাঁর নামাজ কাজা হয়ে যায়। সূরাহ আবাসায় আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে একটি ব্যাপারে শুধরে দিয়েছেন। মানবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই যদি আল্লাহ শুধরে দিয়ে থাকেন তাহলে অন্য কেউ নিজেকে ত্রুটিমুক্ত দাবি করা বা কাউকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বোকামিরই নামান্তর। যদি আমরা ত্রুটিমুক্ত হবার ক্ষমতা রাখতাম তাহলে আমাদের পৃথিবীর জীবনটার কোনো প্রয়োজনই হতো না, কেননা যে পরীক্ষায় কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না তাকে কি পরীক্ষা বলা যায়?

আরেকটি ব্যাপারে আমার মোহ ভঙ্গ হয় জীবনের পথ বহুদূর পাড়ি দেওয়ার পর। সৌভাগ্যক্রমে পক্ষপাত ব্যাপারটি আমার চরিত্রে ছিল না কখনোই। বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিল বেশি, কিন্তু তাই বলে মায়ের সাথে অন্যায্য আচরণ করে তিনি কোনোদিন আমার সমর্থন পাননি। ছোট ভাইটিকে নিজের সন্তানের মতোই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, কিন্তু বড়টির প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করে পার পায়নি সে। ইসলামে ভালোবাসা এবং আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা কেবলমাত্র তাঁরই জন্য, সত্য এবং মিথ্যার মাপকাঠি হিসেবেও সেটাই প্রযোজ্য যা তিনি দিয়ে দিয়েছেন। যদি আমরা পরিবারের প্রতি আনুগত্যকে সর্বোচ্চ স্থান দেই তাহলে আমরা মূলত তাই করব যা কাফিররা করেছিল। গোত্রপ্রীতির কারণেই তাদের অনেকে সত্য জেনেও গ্রহণ করতে পারেনি। আমার পরিবারের কেউ ভুল করলে তাকে সমর্থন দেওয়া নয়, সংশোধন করাই প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে আমার বন্ধুটি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত কি না, নইলে তাকে আমার সত্যের প্রতি আহ্বান করতে হবে, অন্যায়ের পথে তাকে সমর্থন দিয়ে তার কোনো উপকার

আমি করতে পারব না, বরং দু'জনেই ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য এবং ন্যায়কেই সমর্থন দিতে হবে, যদি তা আমার নিজের বিরুদ্ধেও যায়। এখানেই একটা গলদ করে বসেছিলাম বহুবছর আগে, কারণ ভালোবাসা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এক ব্যক্তিকে বড় ভালোবাসতাম, যার মাঝে কোনোদিন কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলাম তিনি সবাইকেই সন্তুষ্ট রাখতে চান। দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া হলে উভয়কেই তিনি বলবেন, 'তুমিই ঠিক বলেছ!' কিন্তু সত্যের মাপকাঠি তো কাউকে সন্তুষ্ট রাখার ওপর নির্ভর করতে পারে না, যিনি এই মাপকাঠি প্রণয়ন করেছেন তাঁকে ছাড়া, আর তিনি কেবল ন্যায় ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না! অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন, যখন বুঝতে পেরেছিলাম 'সদা সত্য বলিব' সংকল্প নিয়েও আমি কত বড় একটা মিথ্যাকে দেখতেই পাইনি এতদিন!

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই। আমরা কেউ ত্রুটিমুক্ত নই, হওয়া সম্ভবও না, এমনটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাও আমাদের কাছে আশা করেন না। তাহলে ক্ষমার প্রয়োজন হতো না, তিনিও নিজেকে বার বার ক্ষমাশীল হিসেবে পরিচয় দিতেন না। আমাদের যা করণীয় তা হলো সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করার মতো জ্ঞান অর্জন করা, অতঃপর প্রাত্যহিক জীবনে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করা। সেখানে ভুল হবে, কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে সত্যকে স্বীকার করার এবং মিথ্যাকে সংশোধন করার। এটা নিজের ত্রুটির ব্যাপারে তো বটেই, অন্যকেও সাহায্য করতে হবে তার দুর্বলতা থেকে উত্তরণের জন্য। শেষতক যেটা আসল কথা সেটা হলো, চেষ্টাটাই আসল এবং চেষ্টাটা হতে হবে আন্তরিক। আমি খুব ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তাই আমার চেষ্টা চৌবাচ্চার ছিদ্র আটকানোয় বেশি নিয়োজিত, চৌবাচ্চা ভরার চেয়েও। ভালো কাজ করা আমার কাছে পরের ব্যাপার, মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতেই তো হিমসিম খাচ্ছি! নিজে দুর্বল বলেই হয়তো আমি অন্যের দুর্বলতা বুঝি। নিজের বেলা যেমন হাজারটা ত্রুটির মাঝেও একটি ভালো গুণ খুঁজে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করি, 'না, তোমার একটি হলেও ভালো গুণ আছে, তুমি একেই বিকশিত কর।' তেমনি অন্যের শত ত্রুটি দেখেও তার মধ্যে ভালো কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করি যা দিয়ে তাকে উজ্জীবিত করা যায়, যা

হয়তো কোনো একদিন তাকে নিজেকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। এর জন্য যদি কেউ আমাকে বোকা ভাবে তবে আমার বোকা হতে আপত্তি নেই।

আমার মতে, অসহিষ্ণুতাই দুর্বলতা। আমি যদি আমার আশেপাশের সবার প্রতি সহিষ্ণু হই, হয়তো আমার প্রভু আমার প্রতি দয়ার্দ্র হবেন। আর যদি সব হিসেব এখানেই চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো তিনি বলবেন, 'তুমি যা চেয়েছো তা তো পেয়েই গিয়েছ, তাহলে আমার কাছে কী চাই?' কিন্তু একটু ধৈর্য আর একটু সহানুভূতি নিয়ে এই জীবনটুকু পার করে দিতে পারলে হয়তো ব্রাউনিংয়ের 'Patriot'এর মত আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে পারব, 'This God shall repay: I am safer so,' 'আমার প্রতিদান আল্লাহর কাছে, সেটাই অধিকতর নিরাপদ।' কারণ, আমি নিশ্চিত জানি তাঁর কাছে আমার কণা পরিমাণ ভালো কাজ, কণা পরিমাণ মন্দ কাজ, ভালো কথা, মন্দ কথা—সবকিছুর হিসেব সংরক্ষিত আছে; এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনো তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত' (সূরাহ আন-নাহ্‌ল, ১৬:৯৬)।

তিনি যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আমার সবচেয়ে ভালো কাজটির ওপর ভিত্তি করেই আমাকে বিচার করবেন সেক্ষেত্রে অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর চেয়েও সেই একটি ভালো কাজ কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা গবেষণাই কাজ দেবে বেশি। সুতরাং, মানুষের বিচার করা আমার কাজ নয়, কারও কাছে কোনো আশাও রাখি না। যদি ভুল করে ভালো মনে করে কারও কাছে কষ্টও পাই, তাতেও ক্ষতি নেই; যতক্ষণ না আমার দ্বারা কারও প্রতি অবিচার হচ্ছে। সেক্ষেত্রে হয়তো কাউকে ভালো মনে করার কারণেই পার পেয়ে যেতে পারি, আর যে আমাকে বোকা ভেবে বঞ্চিত করল সে বুদ্ধিমান হয়েও আটকে যেতে পারে!

সব ক'টা জানালা খুলে দাওনা

মাঝে মাঝে মাথাটা ধবধবে সাদা কাগজের চেয়েও ফাঁকা হয়ে যায়। ফারাক্কার প্রভাবে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া কৃষকের ফসলের ক্ষেতের চেয়েও ভয়ানক খরার সৃষ্টি হয় মগজের ভেতর। কাগজের ওপর অনড় কলম বা কম্পিউটারের কিবোর্ডে নিষ্ক্রিয় হাত দু'টো জানান দেয় মস্তিষ্কের অলসনিদ্রার কাহিনী। আবার মাঝে মাঝে চিন্তা-ভাবনার জগতে কল্পনার বৃষ্টি নামে। হালকা মধুর বৃষ্টি না, একেবারে ধুন্ধুমার বৃষ্টি-বন্যায় ভেসে যায় সব, কাদা-পানিতে কিছুই জন্মাতে পারে না। মাথাভর্তি গিজগিজে ভাবনার কিছুই শেষপর্যন্ত কাগজতক পৌঁছতে পারে না। কবি হলে আক্ষেপ করতাম, জন কিটসের মতো বলতাম, 'হায়! যদি আমার সমস্ত ভাবনা, কল্পনা, মনের মাধুরি কাগজে ঢেলে সাজানোর আগে আমার মৃত্যু ঘটে!' কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের মনের ভেতর কত কী যে আসে যায় তা জানার জন্য পৃথিবী মুখিয়ে নেই, তাই ভাবনাগুলো তার সাথে কবরে চলে গেলেও পৃথিবীর তাতে কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। ফলত, আমার এই খরা বা বন্যার নিষ্ফলতায় আমার কোনো আক্ষেপ নেই।

নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ভালোবাসি। একাকীত্ব নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা বা মন খারাপ কোনোদিন অনুধাবন করতে পারিনি। কারণ আমার কল্পনার পৃথিবীটা আমাকে এতটা ব্যস্ত রাখে যে, আমি ভিড়ের মাঝেও একাকীত্ব খুঁজে পাই, আবার জনশূন্যতার মাঝে ভিড়। একখানা মনের মতো বই পেলে হারিয়ে যেতে পারি পৃথিবীর সব বন্ধন ছিঁড়ে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা-

ভাবনা কল্পনার মাঝে অবগাহন করে মণিমুক্তা তুলে আনার ব্যবসা হামেশাই লাভজনক প্রমাণিত হয়। তবুও আমাকে পৃথিবী কাছে ডেকে নেয় বারবার। আশেপাশের মানুষগুলো হৃদয় চিরে দেখায় সেখানে কত কী লুকিয়ে আছে। আলতো হাতে পরশ বুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, যদি তাতে ব্যথা কিছু কমে! দু'টো কথা, একটু হাসি অনেক সময় মলমের কাজ দেয়। ভাবি, অন্তত এইটুকু তো আমরা সবাই সবার জন্য করতে পারি। নিখরচা এইটুকু কাজে দু'টো মিনিট সময় ব্যয় করতে কেন যে আমাদের এত অনীহা!

ছোটবেলায় ভুপেন হাজারিকার গলা শুনতে পেলেই ছুটে যেতাম, গলা মেলাতাম—'আমি এক যাযাবর!' তখন ছিলাম কাগজে-কলমে যাযাবর। পৃথিবীর পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতাম বাবার সাথে। বড়বেলায় এসে আরেক দেশে যাযাবর বনে গেলাম, যার অস্তিত্ব আগে কখনো এতটা ধরা দেয়নি আমার কাছে, বা হয়তো আমিই ধরা দিইনি তার কাছে। মানুষের মন এক অদ্ভুত পৃথিবী। এর কোনো কোনোটা রূপকথার মৃত্যুপুরীর মতো ভয়ানক, কন্টকাস্তীর্ণ, পথের বেড়ে কঙ্কালের হাসি। কোনো কোনোটা ধুলাবালি, মাকড়ের জাল আর জঞ্জালে ভরা, বন্ধ দরজা জানালা দিয়ে এক ফোঁটা আলো প্রবেশ করতে পারে না। কোনো কোনোটার ছাদ দিয়ে আকাশ দেখা যায়, কিন্তু অযত্নরক্ষিত সেই ঘরে ঠিকমতো আলো খেলতে পারে না, বাতাস এসে উড়িয়ে দিতে পারে না কোণে কোণে জমে থাকা অহেতুক জঞ্জাল। কোনো কোনো মনের ঘরে বাগান দেখেছি যাতে নিত্য ফোটে গোলাপ, গাঁদা, বেলী, চামেলি। আর কিছু কিছু মন দেখেছি সূর্যের মতো আলোকিত।

ইচ্ছে ছিল সাইকোলজি পড়ার, পড়লাম ইংরেজি। সাহিত্য মানুষের মনের বিচ্ছুরণ। সুতরাং এতে সাইকোলজি এমনিতেই পড়া হয়ে যায়। হীথক্লিফ থেকে সিডনি কার্টন, ম্যাডাম ডিফার্জ থেকে জেন এয়ার—সবার মনের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে আসা যায়। সহজেই বোঝা যায় কেউ সম্পূর্ণ খারাপ বা পরিপূর্ণ ভালো হতে পারে না, তবে সবারই ভালো হবার আশা আছে, এমনকি সেটা যদি হয় তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। ডিকেন্সের 'টেল অব টু সিটিজ' পড়ে চার্লস ডারনেকে যেমন আদর্শ মনে হয়েছিল, সিডনি কার্টনকে লেগেছিল ততটাই অসহ্য। কিন্তু সেই লোকটাই এমন একজনের জীবন রক্ষা করল যাকে সে আদতে সহ্যই করতে পারে না। তাই তো সে মৃত্যুর মুহূর্তে

বলতে পারল, 'It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to, than I have ever known'। সুতরাং, যে কেউ জীবনের যেকোনো মুহূর্তে বাজিমাত করে দিতে পারে। তাই আমি এই মনগুলোর ভেতর উঁকি দিয়ে কখনো হতাশ হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাই না। বরং আশ্চর্য হই এটা অবলোকন করে যে,তার প্রত্যেকটিই ভালো হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায়, আলোকিত হতে চায়।

তবুও পৃথিবীর মানুষগুলো সভ্যতা নিয়ে চিৎকার করতে করতে কেমন যেন অসভ্য হয়ে যাচ্ছে! প্রগতি কবে কীভাবে যেন উল্টোপথে চলা শুরু করেছে, অথচ মানুষগুলো তা টের পায়নি। আমরা কবে যেন মানুষ থেকে যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছি নিজেরাই বুঝতে পারিনি। এখন আমরা বিরামহীন দৌড়ের ওপর আছি, আমাদের প্রয়োজন টাকা আর টাকা। বেগম রোকেয়া যেমন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমরা ভুলে গিয়েছি খাওয়ার জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন'। আমাকেও আক্ষেপ করতে হয়, আমরা ভুলে গিয়েছি যে, টাকার জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য টাকার প্রয়োজন। আমাদের সময় নেই পরস্পরের সাথে একটু সুন্দর করে দু'টো কথা বলার, সময় নেই একটি শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করার, সময় নেই বৃদ্ধ বাবা-মার সাথে বসে দু'দন্ড গল্প করার, সময় নেই স্ত্রীর সাথে বসে একটু হাসি-কৌতুক করার, সময় নেই স্বামীর মন খারাপ কেন খোঁজ নেওয়ার, সময় নেই ভাইবোনের সাথে বসে দু'টো উপদেশ দেওয়ার, সময় নেই অভাবের তাড়নায় রাস্তায় ফুল বিক্রি করতে নামা শিশুটির দিকে একটু হাসিমুখে তাকানোর; সময় আছে শুধু টাকা কামানোর আর খরচ করার। এই জীবন আমাদের কাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণতার সন্ধান দিতে পারে না। আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কল্পনা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু যখন আমরা নিজেই, আমাদের পৃথিবী যখন আবর্তিত হয় কেবল 'আমি'কে ঘিরেই, তখন এই ক্ষুদ্রতা বদ্ধ জলাশয়ে ব্যাঙাচির ঝাঁকের মত ব্যাধির জন্ম দেবে সেটাই তো স্বাভাবিক! তাই আমাদের মনে রোগ সৃষ্টি হয় প্রতিনিয়ত।

এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য অন্তর্চক্ষু খুলে তাকানোর কোনো বিকল্প নেই, স্পিরিচুয়ালিটির কোনো বিকল্প নেই। এপিকিউরিয়ানদের মতো কিছু কিছু মানুষ কেবল জান্তব লেভেলে বাঁচে, তাদের স্পিরিচুয়ালিটির কোনো

প্রয়োজন বা বালাই নেই; খেয়েদেয়ে ফূর্তি করে একদিন হুট করে মরে যায়। তারা একরকম ভালোই আছে; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই নেই তাদের। আর কিছু মানুষ ধর্মচর্চা করে, কিন্তু ধর্ম বোঝে না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো মানুষের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে, ঈমান বৃদ্ধি করে। আমরা যদি সারাজীবন ধর্মচর্চা করেও মনের দরজা-জানালাগুলো খুলে আলোর সন্ধান পাবার পর্যায়ে পৌঁছতে না পারি, তার চেয়ে হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি বোধ করি গ্রিক ট্র্যাজেডির মাস্টার ইস্কাইলাসও লিখতে পারেননি। তাকওয়ার উন্নতি তখনই সম্ভব যখন ধর্মীয় চর্চা এবং ধর্মবোধ আমাদের মাঝে পরিমিতি এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে। তখন আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ডি পেরিয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারব, নিজেদের চাহিদাকে লাগাম পরিয়ে দিয়ে অন্যের চাহিদা পূরণ করতে পারব, নিজের আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে অন্যের আবেগের মূল্যায়ন করতে পারব...। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, চাই শুধু নিজেকে উজ্জীবিত করা। তাই বুঝি ব্রাউনিং বলেছিলেন, 'Ah, but a man's reach should exceed his grasp, or what's a heaven for?' (মানুষের আকুতি যেন হয় তার নাগালের বাইরে, নইলে বেহেশত পাবে কী করে?)

সবাই যদি জান্নাতের সন্ধানে পথ চলত, পৃথিবীটা হতো স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর!এই সুন্দরের কল্পনায় দিন কেটে যায় সোনালি পাখায় ভর করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে সুন্দর স্বপ্নগুলোর কথা সবাইকে বলতে, সবাই মিলে স্বপ্ন দেখতে... তারপর আবার ভাবি,কী হবে জানিয়ে? যাদের প্রশংসা করার অভ্যাস তারা বলবে, 'বাহ, বাহ! ভালো কথা!'; যাদের মনের পরতে পরতে বিদ্বেষের আস্তরণ জমে কালশিটে পড়ে গেছে তারা বলবে, 'তুমি নিজে কেমন, আগে তাই দেখ বাপু!' একসময় প্রশংসা আর সমালোচনা দু'টোই হারিয়ে যাবে কালের গহীন আবর্তে, তারপর আবার পৃথিবী ফিরে যাবে তার সনাতন ধারায়; আমার, আমাদের স্বপ্নগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে থাকবে পথের ধুলোয়। আমার এই চিন্তা-ভাবনা কাউকে সাময়িক স্পর্শ করলেও আমি শেলি, ব্রাউনিং বা জেন অস্টেন নই যে, দীর্ঘস্থায়ী কোনো ফলাফল রেখে যাওয়া যাবে। তাই ভাবি, লিখব? লিখে কী হবে? তার চেয়ে থাক না আমার সুন্দর কল্পনাগুলো মনের গোপন কুঠুরিতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিরাপদ পবিত্র এক স্বপ্ন হয়ে!

রেহনুমা বিনত আনিস

জন্ম চট্টগ্রামে, শৈশব ঢাকায়, কৈশোর আবুধাবি ও ভারতে। বিয়ের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসা। বর্তমানে স্বামী ও দুই সন্তানসহ ক্যানাডায়। আদর্শবাদী ও জ্ঞানানুরাগী একটি পরিবারে বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকেই মুখচোরা। বইপোকা।

ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স। ছাত্রাবস্থায় চট্টগ্রামের সিজিএস ও প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা। মাস্টার্সের পর ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অনেক দিনের।

ভালো লাগে বিশ্বসাহিত্য। অত্যধিক আগ্রহের ফলে জ্ঞানের মোটামুটি সব শাখাতেই অল্পবিস্তর বিচরণ।

ছোটবেলায় 'শিশু' ম্যাগাজিনে ছোটদের লেখা পড়ে উদ্দীপ্ত হয়ে লেখালেখিতে হাতেখড়ি। পাঁচ বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা দিয়ে সূত্রপাত হলেও প্রথম প্রকাশ নয় বছর বয়সে, আবুধাবির ইয়াং টাইমস এবং জুনিয়র নিউজে। ইয়াং টাইমসে নির্বাচিত লেখিকা হয়ে সামান্য পরিচিতি। এস এস সি'র পর দেশে ফিরে প্রথম বাংলায় লেখালেখি শুরু। পরবর্তীসময়ে বৃহত্তর অঙ্গনে পদচারণা, নানান কাজে সংশ্লিষ্টতা এবং শিক্ষকতার সুবাদে নানা রঙের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝাই হয়েছে ঝুলি।

সমাজের নানা সংগতি-অসংগতি নিয়ে ভাবনাটা আর দশজনের সাথে ভাগাভাগি করতে গিয়ে লেখালেখির বিস্তৃতি। পাঠকদের চিন্তাশীলতা জাগ্রত করতে পারাতেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা।

বস্তুবাদী সভ্যতায় সবকিছুরই মূল্যায়ন হয় তার বাজার দরের উপর। যা কিছু অর্থ-বিনিময়ে বিকোয় না তার সেখানে কোনো মূল্য নেই। তাই বেচা-কেনার এ বাজারে তারা সব কিছুকেই তুলেছে, সব কিছু...। রূপ-লাবণ্য, জীবন-যৌবন সবই সেখানে পণ্য; বেচাও যায়, কেনাও যায়।

সব কিছুকে অর্থ-মূল্যে মূল্যায়নের এ অশুভ স্বভাব তাদের কোন নরকে নিয়ে গেছে সে প্রশ্নের উত্তর এখানে সরাসরি নেই। নানারকমের আত্মজিজ্ঞাসা আছে, বইমেলা আছে, ওজন বিড়ম্বনার কথা আছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মার উন্নয়নের কথা আছে, ভালো শাশুড়িদের গল্প আছে। আছে আরও নানা কিছু।

আশা করি বইটা পড়তে পড়তে এমন আরো নানা বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাবে।

ISBN 978-984-33-8900-8

www.seanpublication.com